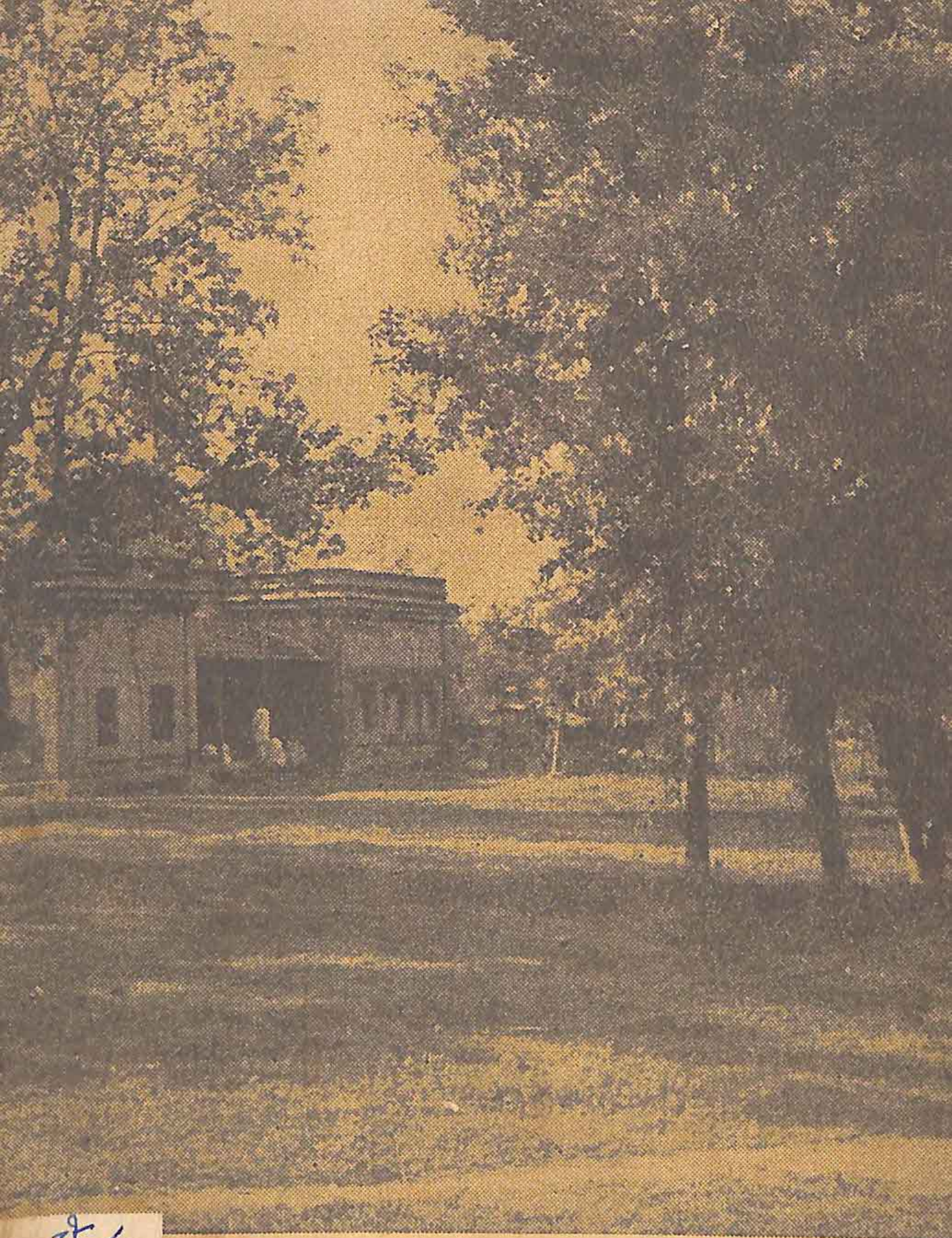


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ

১৯ চৈত্র ১৩০১ - ২৫ চৈত্র ১৩৬৪

শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ-সমিতি
শান্তিনিকেতন

প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৩৬৬

সম্পাদনা : সুধীরচন্দ্র রায়, কাশীনাথ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সরকার

প্রকাশক : ক্ষিতীশ রায়
শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ-সমিতি, শান্তিনিকেতন

মুদ্রাকর : বিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

মূল্য : দুই টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের পরলোকযাত্রার কিছু দিন পরে তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই বললেন দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অধিক কাল ধরে তিনি যে আশ্রমের অব্যাহত সেবা করে গেলেন, এটি এমন একটি বিশেষ ঘটনা যা আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য স্মরণীয় রাখা কর্তব্য।

ইতিমধ্যে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা ২৫ এপ্রিল ১৯৫৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি স্মৃতিসভায় সমবেত হয়ে তনয়দা সম্বন্ধে তাদের স্মৃতিকথা পড়ে শোনাল। তনয়েন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র শিশুবিভাগের বারান্দায় এই সভা বসেছিল। সহজ সরল ভাষায় এই সব লেখা থেকে তনয়দার সুন্দর একটি ছবি ফুটে উঠল। পাঠভবনের অধ্যক্ষ-প্রমুখ কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন এ-লেখাগুলি একত্র ছেপে প্রকাশ করতে পারলে ভালো হয়। পুলিনবিহারী সেন বললেন এ-কালীন ছাত্রছাত্রী ছাড়াও তনয়েন্দ্রনাথের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং তাঁর সহকর্মীরা কেউ কেউ নিশ্চয় চাইবেন এরকম একটি স্মারণিক পুস্তকের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে।

স্থির হল সুধীরচন্দ্র রায়, কাশীনাথ ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন সরকার তিন জন মিলে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করবেন ও পরিকল্পিত পুস্তক সম্পাদনা করবেন। তদনুসারে তাঁরা বিশ্বভারতী নিউজ-পত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন :

> এই পুস্তকের বিষয়বস্তু হল মানুষ ও শিক্ষকরূপে তনয়েন্দ্রনাথ বিষয়ে স্মৃতিকথা। তাঁর জীবন ও আচরণে তিনি গুরুদেব ও এই আশ্রমের যে-ঐকান্তিক সেবা করে গেছেন, এ পুস্তকের প্রধান লক্ষ্য হবে সেই সব তথ্য সকলের গোচর করা। বস্তুতপক্ষে, তাঁর মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণই তদীয় স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন। যাতে সেই যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুরাগ জন্মায় এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হল তাই।

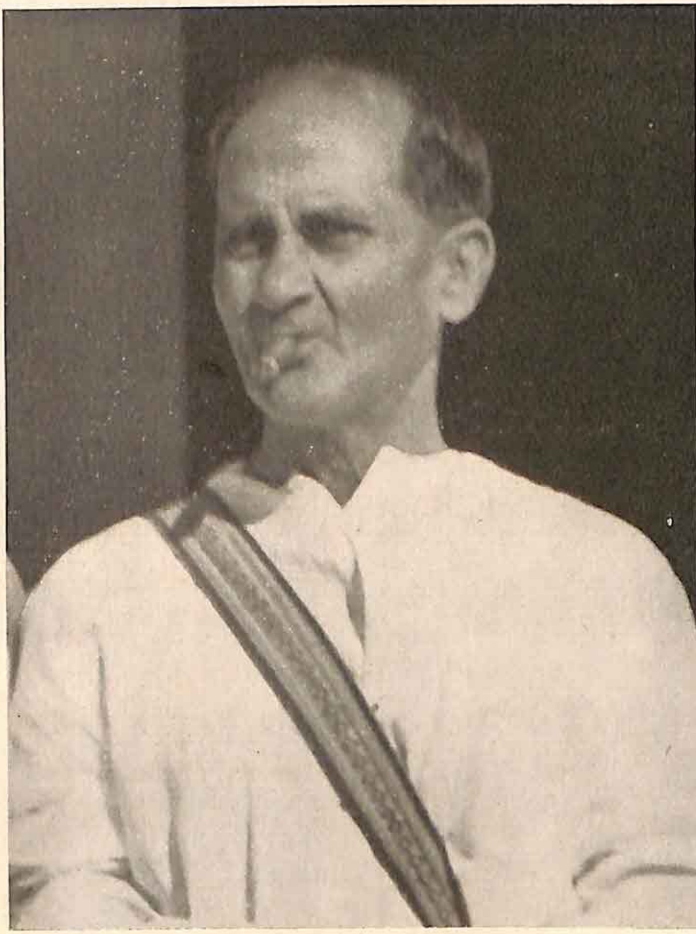
সংক্ষেপে এই হল স্মারণিক পুস্তকের জন্মকথা।

এক থেকে তেরো সংখ্যক লেখা পূর্বে বর্ণিত সেই স্মৃতিসভায় পঠিত। নিরঞ্জন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা অন্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। বাকি রচনা লেখকেরা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখায় যে-চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে চিঠি তনয়েন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পুলিনবিহারী সেনকে। তাঁর লেখা অন্য চিঠিগুলি পাওয়া গেছে কন্যা নিবেদিতা বসুর কাছ থেকে। এগুলির কিছু হয় তো পোস্ট করা হয়েছিল, কিছু হয়নি। তনয়েন্দ্রনাথ তাঁর চিঠি লেখার স্বভাব সম্বন্ধে স্বয়ং বলেছেন :

> আমার পুরানো কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে অনেক চিঠি পাই, যা আমারই লেখা, কিন্তু ডাকে ফেলা হয়নি। খানিকটা লেখা চিঠি, পুরো লেখা চিঠি—দুরকমই আছে।

তনয়েন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাস দু-তিন আগেকার শেষ ফটোখানি তুলেছিল এখানকার প্রাক্তন অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্তর বড় ছেলে ডল্, কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত। গত ৮ জানুয়ারি দুর্গাপুরের কাছে শোচনীয় মোটর-দুর্ঘটনায় তরুণ ইঞ্জিনীয়ার কল্যাণকুমারের মৃত্যু হয়। ডল্ তনয়দাকে বড় ভালোবাসত—সেই ভালোবাসার স্মৃতিচিহ্ন-রূপে এই ছবিখানি রয়ে গেল। ছোট বড় নানা বয়সের লেখক নিজের মতো করে তনয়েন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সেই সব লেখা একত্র প্রকাশের সুযোগে আমাদের শ্রদ্ধাও যুক্ত করে দিলাম। ইতি শান্তিনিকেতন ১৫ শ্রাবণ ১৩৬৬



এক : অভিজিৎ মিত্র

একদিন আমরা শিল্পসদনে বসে গল্প করছি, এমন সময় তনয়দা সাইকেল চড়ে শিল্পসদনে এলেন।

তিনি সব সময় বাচ্চাদের সঙ্গে ঠাট্টা করতেন। আমাদের ওখানে একজন মেয়ে ছিল, তার নাম মায়া। তার সঙ্গে ঠাট্টা করলে সে কেঁদে ফেলত বা রেগে যেত। তনয়দা বোধ হয় সে-কথা জানতেন। তিনি এসে আমাদের সঙ্গে অনেক কথা বলতে লাগলেন।

আমরা বললাম যে, মায়া খুব ভালো দৌড়তে পারে। তখন তিনি বললেন : আচ্ছা, মায়া আর বাব্‌লা পাল্লা দিয়ে দৌড়ও। তখন বাব্‌লা ও মায়া দৌড়ল। জিতল মায়া। তনয়দা মায়ার সাথে এত ঠাট্টা করছিলেন যে, মায়া ভীষণ রেগে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মায়া কাশীনাথদাকে নালিশ করে দিয়েছিল।

আমি তনয়দার কাছে কোনো দিন ক্লাস করিনি, তাই আমার তনয়দার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল না। তবুও তাঁকে যত বার দেখেছি, যত বার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি তত বারই কেন যেন মনে হয়েছে তিনি খুব রসিক লোক। তাঁর কথাগুলোর মধ্যে সব সময় একটা ঠাট্টা-ঠাট্টা ভাব থাকত। তনয়দার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব মজা লাগত এবং তাঁকে আমি খুব ভালোবাসতাম।

দুই : কৃষ্ণা সেন

আমি যখন প্রথম ভর্তি হয়ে দিদার বাড়ি গিয়েছিলাম তখন দেখলাম তনয়দা একটা ছোটো ইজিচেয়ারে বসে চুরুট খাচ্ছেন। আমি গিয়ে তনয়দাকে প্রণাম করলাম। তনয়দা হাসলেন। আমি তারপর থেকে তনয়দাকে চিনে ফেললাম।

উনি ক্লাস ছাড়া প্রায় সব সময় চুরুট খেতেন। প্রথম দিন আমি যখন ক্লাসে যাই তখন তনয়দা বললেন: পড়াশোনা কেমন পারলে? আমি বললাম: জানি না। তনয়দা বললেন: তাহলে তুমি কিছুই জান না। এই বলে উনি চলে গেলেন।

আমি যখন পুজোর ছুটির পর শান্তিনিকেতনে এলাম, তনয়দা বললেন: কি কি খেলে? আমি বললাম: বিস্কুট ও চারটে টফি। উনি বললেন: আমার জন্য কিছু রেখেছ। আমি বললাম: হ্যাঁ রেখেছি। উনি বললেন: তোমার কতখানি ভুঁড়ি হল? আমি বললাম: আমার ভুঁড়ি হয়নি। তনয়দা বললেন: আমি যদি খেতাম তাহলে আমার ভুঁড়ি হত।

যেদিন আমি শুনলাম, তনয়দা আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেছেন, সেদিন আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তনয়দার টাক দেখে আমার দাদুর কথা মনে হত। আমি ইতিহাসপরিচয় থেকে তনয়দার লেখা 'সক্রেটিস' গল্পটি আর সহজ পাঠ থেকে 'জয়তিলক' ও 'কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা' গল্পটি পড়েছি। আমার খুবই ভালো লেগেছে। পড়তে পড়তে অনেক সময় আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে ওঠে।

তিন : কৃষ্ণা বক্সী

গত ৮।৪।৫৮ তারিখে রাত্রে তনয়দা আমাদের ছেড়ে নতুন পথে যাত্রা করেছেন। পরের দিন ছিল বুধবার, তাই সাদা জামা-কাপড় পরে ঘরে বসে নূতন বইগুলি নাড়াচাড়া করছি আর ভাবছি যে তনয়দার বইগুলো আগে মলাট দেব, না হলে ক্লাসে বকুনি খেতে হবে। এমন আরো অনেক কথাই তনয়দার সম্বন্ধে ভাবছি, এমন সময় কয়েক জন মেয়ে ছল্‌ছল্ চোখে এসে বলল : তনয়দা মারা গেছেন।

আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারপর স্বচক্ষে দেখে এলাম তিনি শুয়ে আছেন আর বেবিদি কাঁদছেন। আমি ওখানে আর থাকতে পারলাম না। শ্রীসদনে ফিরে এসে ফুল তুলে মালা গাঁথলাম। তনয়দাকে দুপুর দুটোর সময় খাটের উপর শুইয়ে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, শালবীথির মধ্যে দিয়ে, মন্দিরের সামনে দিয়ে, শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল।

সেই সময় কয়েকটা দিনের ঘটনা বেশ মনে হতে লাগল। সেই ১৯৫৩ সালের পয়লা জানুআরির প্রথম পর্বে প্রভাকরদার সঙ্গে তনয়দার কাছে অংক করতে গিয়েছিলাম। তখন দেখি মোটে চার পাঁচ জন ছেলে তনয়দার কাছে পড়ছে। তনয়দা আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি নাম বললাম। তারপর বললেন : বাংলা জান ? আমি বললুম : জানি না। উনি তখন বেশ কিছুক্ষণ হোহো করে হাসলেন, ওঁর সঙ্গে ছেলেরাও হাসল। তনয়দার কথাবার্তা শুনে এবং ভাবভঙ্গি দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম তনয়দার মাথায় ছিট আছে। তখন আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। তিনি বোর্ডে বাংলায় ১৫ লিখে পড়তে বললেন। আমি হিন্দিতে পড়লাম : পন্দ্র। তখন আবার তনয়দা খুব হাসলেন। সেই পর্বটা আমাকে নিয়েই কেটে গেল। এই প্রথম দিনকার কথা নিয়ে তনয়দা কিছুদিন আগেও আমায় খেপিয়েছেন, আবার

অনেককে বলেওছেন। কিছুদিন পরে অনেক ছেলেমেয়ে ভর্তি হল, তার মধ্যে একজনের নাম সুদর্শনা, ডাক নাম বুড়ি। তাকে বলতে গেলে প্রতি দিনই খেপাতেন, কয়েক দিন কেঁদেছিল বলে তিনি ক্লাস থেকে বুড়িকে বার করে দিয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালে ডিসেম্বর মাসে একদিন তনয়দা আমাদের ক্লাসের সবাইকে কোপাইয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে আমরা তনয়দার বাড়ি গেলাম। এখন যেটা নিরঞ্জনদার বাড়ি, আগে তিনি ঐ বাড়িটাতে থাকতেন। আমাদের চার খানা করে বিস্কুট দিলেন, তারপর আমরা রওনা হলাম। তিনি এক ব্যাগ ভরতি টফি ও বিস্কুট সঙ্গে নিলেন। আমরা পথে খুব মজা করতে করতে টফি বিস্কুট উদরস্থ করেছিলাম।

আমরা কোপাই পৌঁছলাম। তনয়দা গ্রাম থেকে কিছু মুড়ি ও লবাত কিনে দিলেন। ওখানে বসে বসে আমরা ঐগুলির সদ্‌ব্যবহার করলাম। তারপর আমরা জলে নেমে খেলতে লাগলাম আর তনয়দা পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ওখানে গিয়ে আমরা অনেক গল্প আর মজা করলাম। আবার আমরা মজা করে শান্তিনিকেতন ফিরে এলাম। কয়েকজন মেয়ে দল ভেঙে আগে শ্রীসদনে এসেছিল এবং তারা ভিজেছিল বলে বকুনি খেয়েছিল। আমরাও ভিজেছিলাম, কিন্তু আমাদের তনয়দা পৌঁছে দিয়েছিলেন বলে আমরা আর বকুনি খাইনি।

১৯৫৪ সালে বর্ষাকালে আমার হাম হয়েছিল। আমি জানলা দিয়ে প্রত্যেক দিন ফুটবল খেলা দেখতাম ; কোনো-কোনো দিন তনয়দা আমাকে 'চিড়িয়াখানার বাঁদর' বলে চলে যেতেন। একদিন তাঁর ছাতা, ব্যাগ প্রভৃতি রেখে তনয়দাও ফুটবল খেলতে নেমেছিলেন। তনয়দাকে আমি মাত্র সেই একদিনই ফুটবল খেলতে দেখি।

১৯৫৫ সালে একদিন মাঠে সবাই খেলছিলাম, সেইদিন তনয়দাও খেলার মাঠে ছিলেন। কাউকে খেপাচ্ছিলেন আর কারও নামে সুখ্যাতি করছিলেন। এমন সময় একটু-একটু হাওয়া বইতে লাগল ও বৃষ্টি পড়তে লাগল। তখন বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাড়ি চলে গেল। তার পরেই হঠাৎ এল ভীষণ ঝড়; কোনোদিকেই কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমরা শ্রীসদনে যেতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কিছুতেই যেতে পারছিলাম না। তনয়দা জানি না কেমন করে বেণুকুঞ্জে উঠেছিলেন। তারপর যখন ঝড় একটু শান্ত হল আর তনয়দা বাড়ি যাচ্ছেন, তখন আমরা কয়েকজন মিলে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম :

দাদুর মাথায় টাক ছিল
সেই টাকে তেল মাখছিল
এমন সময় বোলতা এসে
হুল ফুটিয়ে পালায় শেষে।

দাদু কিন্তু এতে চটলেন না, হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আমাদের যে এইভাবে তনয়দাকে হারাতে হবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমার সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে শেষ যেদিন ক্লাস নিয়েছিলেন। সেইদিন ক্লাসে ঢুকেই বলেছিলেন : আমাকে আজ কেউ বিরক্ত কোরো না, কাল রাত্রে আমার খুব কষ্ট হয়েছে, ঘুম হয়নি।

চার : বিশ্বেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে তনয়দার যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি খুব রাগী।

তিনি কখনো ইংরেজি শব্দের বাংলায় মানে বলতেন না। যেমন করেই হোক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন।

কারও সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করে বলতেন : আমি যা বললাম তা লিখে রেখো; পরে দেখো আমার কথাটা ঠিক হয় কিনা।

আমরা ম্যাপ দেখতে জানতাম না শুনে, তিনি আমাদের ম্যাপ কিরকম ভাবে দেখতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর নিজের সম্বন্ধে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বলতেন। একদিন বলেছিলেন : বোলপুর থেকে ফেরার পথে অদ্বৈত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নলেন গুড়ের সন্দেশ দেখে লোভ হল বলে, এক সের কিনে খেলাম।

একদিন হিরণ্য নামে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের টেলিগ্রাম এসেছিল। পিয়ন খুঁজে খুঁজে শেষে তনয়দার ক্লাসে এসে তাকে দেখতে পেয়ে ইশারা করে ডাকতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ে যাওয়ার দরুন তিনি অমনি করে ডাকতে মানা করে বকুনি দিলেন। পিয়নটি তখন কেঁদে ফেলেছিল।

তনয়দা কান্নাকাটি পছন্দ করতেন না। একদিন সুনন্দা রায়ের নাকে হাত দিতেই সুনন্দা কেঁদে ফেলল। তিনি কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, কৃষ্ণা বলল : ওর নাকে ব্যথা। তাই শুনে তিনি বললেন : যদি ফুঁ দিলে ব্যথা লাগে তবে চলে যাওয়াই ভালো।

সুগতা সেনকে বলতেন : তুমি মুখস্থ করে পাস করবে।

তিনি অনেকের স্বভাব দেখে নিজে আবার নূতন নাম রেখেছিলেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন: বুড়ো বয়সে মরার চাইতে সুস্থসবলে মরা অনেক ভালো। আর একটা কথা তিনি বলতেন: শুনেছি পুত্র হলে মায়েরা মুখে মধু দেয়। আমার মা বোধ হয় দেননি। সেইজন্য আমার মুখ এত খারাপ।

জন্মদিন উপলক্ষে কেউ যখন তাঁকে প্রণাম করত, তিনি বলতেন: কি, একটিন বিস্কুট পাবার লোভে করছ তো? পাবে তুমি বিস্কুট, এখন যাও।

তাঁর কাছে আমরা যে শুধু ইংরেজি শিখতাম তা নয়। অন্য অনেক জিনিস শিখতাম। কোনো-কোনো দিন শুধু বাংলা কথা কয়েই কেটে যেত, আবার কোনো-কোনো দিন একটাও বাংলা কথা হত না।

তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা এখন কেবলই মনে পড়ে, আর মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

পাঁচ : কুম্‌কুম্‌ সেনগুপ্ত

একবার গোসাঁইজীর ক্লাসে আমি তনয়দার নামে একটা রচনা লিখেছিলাম। তার এক ছত্রে লেখা ছিল যে, আমার মনে হয় তনয়দার মাথায় একটু ছিট্‌ আছে। এই কথা তিনি কার কাছে যেন শুনেছিলেন। তাই এই সেদিন হঠাৎ আমাকে ধরে বলেছিলেন : আমার মাথায় তো ছিট্‌ আছে, আর তোমার মাথায় কটা উকুন আছে বলো তো ? আমি তাঁকে বলেছিলাম : উকুন যদি থাকে তো খুঁজে আপনাকে বের করে দিতে হবে।

আবার কখনো আমাকে দেখলেই বলতেন : ব্রহ্মদেশে গিয়ে নাপ্পি খাও। আমিও অবশ্য কম যেতাম না। তনয়দাকে দেখলেই তাঁর দেশের ভাষায় 'নাতি খাতি বেলা গেল' বলে খেপাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু হায় রে, তিনি খেপতেন না, বরং উল্টে নানারকম মজার মজার কথা বলতেন।

আমরা যারা তাঁর ছাত্রছাত্রী হতে পেরেছি তার জন্য গৌরব বোধ করি এবং সৌভাগ্য মনে করি। তিনি আমাদের অন্তর দিয়ে ভালোবেসে গেছেন। তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহ আমরা কোনো দিনই ভুলতে পারব না।

ছয় : সুগতা সেন

আমি তনয়দার কাছে তিন বছর পড়েছি। তাঁর কাছে আমরা ইংরেজি পড়তাম। তাঁকে দেখলে অনেকে খুব ভয় পেত এবং আমিও প্রথম-প্রথম তাঁকে দেখলে খুব ভয় পেতাম। কিন্তু কিছুদিন পরে সে-ভয় ভেঙে গিয়েছিল। তনয়দা আমাদের ক্লাসে বকা-ঝকা করতেন। তাই বলে উনি যে আমাদের ভালোবাসতেন না তা নয়, তিনি আমাদের খুব ভালোও বাসতেন। তিনি আমাদের বলতেন : তোমরা বড়ো হলে কেরানী হবে। একদিন আমার এক বন্ধু আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল দেখে উনি বলেছিলেন : ও তোমার মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে নাকি ?

একদিন তনয়দা এক টাকা বাজি রেখে ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : ছাব্বিশে জানুআরি কেন পতাকা-উত্তোলনের দিন বলে মানা হয় ? আমি তার ঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলাম। তাই তিনি খুশি হয়ে আমাকে একটি টাকা দেন। আমি টাকাটি নিতে চাইনি। কিন্তু তিনি জোর করেই সেটি আমাকে দিলেন। আমি সেই টাকা দিয়ে 'করে দেখ' নামে একটি বই কিনে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম, নাম লিখে দেবার জন্য। তিনি কিছুতেই নিজের নাম লিখলেন না, শুধু এই কথাগুলি লিখে দিলেন :

সুগতা সেন,
শান্তিনিকেতন,
৪ঠা ফাল্গুন ১৩৬৩।

২৬শে জানুআরি কেন স্বাধীনতা লাভের পরেও পতাকা উত্তোলনের দিন বলে মানা হয়, তা আমি বলতে পেরেছিলাম। তাই সেই ফাঁকে বইটা এসে গেল। আমি তখন পড়তাম পঞ্চম বর্গে।

একবার আমাদের একটা খেলা ছিল। সেই খেলা উনি দেখতে

এসেছিলেন। সেই খেলায় আমরা হেরে গিয়েছিলাম। পরের দিন ক্লাসে উনি ভাস্করকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন : তুমি খুব জোরে দৌড়তে পার। আসলে ভাস্কর খুব আস্তে-আস্তে দৌড়য়। তিনি ক্লাসে অনেক মজার-মজার কবিতা বানিয়ে-বানিয়ে বলতেন। কাশীনাথের নামে একটা কবিতা বানিয়েছিলেন :

কাশীনাথ মান্না
লুচি ছাড়া খান্ না
ভোগ না পেলে কান্না।

তনয়দা আমাদের ক্লাসের শান্তাকে বলতেন : কুঁজী বুড়ি। বোর্ডে তার অনেক ছবিও এঁকেছেন। কেউ স্কার্ট পরে ক্লাসে এলে উনি বলতেন : ঠিক মনে হচ্ছে শায়া পরে এসেছ। স্কার্ট-পরা নিয়ে একটা কবিতাও বানিয়েছিলেন :

মিসেস্ আয়া,
পরে চলেছেন শায়া।

তনয়দা আমাদের অনেক ইংরেজি কবিতা শিখিয়েছিলেন। তার একটির কিছুটা তুলে দিলাম :

Betty Botta, bought some butter,
But she said, this butter's bitter.

তাঁর কাছে শেষ ক্লাস করেছি আঠারোই মার্চ, সেদিন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর শরীর ভালো নেই। তারপরেই তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। ৮ই এপ্রিল রাত্রে তিনি আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। তার পরের দিন সকালে যখন খবরটা জানলাম তখন মনে হল যে, আর কোনো দিনই আমরা তনয়দার কাছ ক্লাস করব না।

সাত : মমতা পাল

আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে তনয়দার কাছে ক্লাস করে এসেছি। সত্যি, তাঁর কাছে এক-একদিন আমার ক্লাস করতে খুব খারাপ লাগত। প্রায় ভাবতাম আজ বুঝি তনয়দা ছুটিতে আছেন, কিন্তু আমার ভাবনা অল্পদিনের জন্যই সফল হয়েছে।

পড়া না পারলে তনয়দা গাঁট্টা মারতেন। তিনি খুব ভালো ভাবে পড়াতেন। যতক্ষণ না বুঝতাম ততক্ষণ বুঝিয়েছেন, কোনো সময় বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। সব রকম আনন্দে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগদান করতেন। আমরা তাঁকে শুধু শিক্ষক বলে জানতাম না, নিজেদের আত্মীয় বলে জানতাম। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

মাঝে মাঝে তিনি খেলার প্রতিযোগিতা দেখতে আসতেন, যেদিন ফুটবল হকি-ইত্যাদি থাকত। খেলার মাঠে বসেই আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন যে, তিনিও এককালে খুব ভালো খেলতে পারতেন। তাঁকে খেলার মাঠে দেখলে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে বলত :

দাদুর মাথায় টাক ছিল
সেই টাকে তেল মাখছিল···

তিনি কোনো কথা গোপন রাখতেন না। সামনা-সামনি সব বলে দিতেন। তাঁর হাতের লেখা ও কথাবার্তা খুব স্পষ্ট ছিল। হঠাৎ এক-এক সময় তাঁকে দেখলে কিন্তু খুব ভয় করত, কি করব বুঝতে পারতাম না।

আমাদের এই তনয়দা একদিন রাত্রে আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন। প্রত্যেকের মন ব্যথায় ভরে উঠল। তিনি যেখানে ক্লাস নিতেন সেই জায়গাটা এখন ফাঁকা হয়ে আছে। দেখলেই তাঁর কথা মনে পড়ে এবং

চোখে জল আসে। আমরা তাঁর কাছে তাঁর অসুখের আগের দিন পর্যন্ত ক্লাস করেছি। এখন সারা পৃথিবী খুঁজলেও তাঁকে আর পাব না। তনয়দার অভাব সহজে ভুলতে পারব না।

আট : হেনা দেব

নানা কথায় নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে
আজ কেবলই পড়ছে মনে তনয়দাকে।
সময়-মতো ক্লাসে এলাম আমরা সবাই
তিনি হঠাৎ গেলেন কোথায় বলো না ভাই ?
এতদিন তো আমরা তাঁকেই আপন জানি
গাছের তলায় ঘিরেছি তাঁর আসনখানি।
আজ সে-আসন শূন্য কেন ?
নূতন বছর,
দাও না এনে পার যদি নূতন খবর।
কবে আবার তনয়দাকে পাব ফিরে
কবে আবার বসব আমরা তাঁকে ঘিরে।
সে-তারিখটি জানতে বড়ো ইচ্ছে জাগে
সবচেয়ে আজ তনয়দাকেই ভালো লাগে।

নয় : গীতিকা মজুমদার

গত ৯।৪।৫৮ তারিখে তনয়দা আমাদের আশ্রম থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেদিন ছিল বুধবার। আমরা মন্দিরের জন্য প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় এই দুঃসংবাদ পেয়ে এত খারাপ লেগেছিল যে, তা লিখে বোঝাতে পারব না।

তনয়দা আমাদের এখানকার ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম আত্মীয়রূপে। ১৯৫৫ সালে আমার প্রথম তনয়দার সঙ্গে আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই তনয়দাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি তাঁর কাছে ইংরেজি ক্লাস করতাম। আমি প্রথম-প্রথম তনয়দাকে খুব ভয় করতাম।

তিনি খুব সরল লোক ছিলেন। কোনো কথা গোপন করতেন না। তাঁর মতো স্বাধীনচেতা লোক খুব কম দেখা যায়। আমাদের সব সময় বলতেন : স্বাধীন হতে চেষ্টা করো। কখনও কারও অধীনে থেকো না। ক্লাসে যখন উপদেশ দিতেন তখন মনে হত তিনি কখনও কোনো দোষ করেন নি।

সত্যিই তাঁর মতো লোক পাওয়া দুর্লভ। তনয়দার ক্লাসে আমরা খুব মজা করতাম। এমন কি রাস্তা দিয়ে কোনো লোক গেলে সেও থমকে দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করত। তখন তাকে নিয়ে আর-এক পালা হাসি চলত। তিনি আমাদের ক্লাসের মেয়েদের এক-এক জনকে এক-একটা নাম দিয়েছিলেন, যেমন— আমাকে 'হোটেল-ওয়ালি' মমতাকে 'কুমোর' রমাকে 'মাসিমা' এনাক্ষীকে 'কেটি' কল্পনাকে 'ঢেঁস্থ' 'মাছিমারা' ইত্যাদি। অবশ্য 'মাছিমারা'-নামটা শুধু মাসিমাকে ছাড়া আর-সবাইকে দিয়েছিলেন।

এক-এক সময় তনয়দা যখন রেগে গিয়ে কাউকে গাঁট্টা মারতেন তখন খুব হাসি পেত। কিন্তু আমাদের ভাগ্যেও মার আছে ভেবে তখনকার মতো অতি কষ্টে হাসি দমন করতাম। ছেলেদের মার দেখে আরও বেশি হাসি

পেত। একজনকে ঘোড়ার মতো করে তার পিঠের উপর চড়ে বসতেন। আবার সবাইকে না মেরে যে প্রথম বসত তাকে এক গুঁতো মারতেন আর অমনি সব এর-ওর ঘাড়ের উপর হুড়মুড় করে পড়ত। অনেক সময় আবার মার 'পাস' করে দিতেন। এমনি একজন আমুদে লোক হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমরা খুবই দুঃখ পেয়েছি। তনয়দার মতো লোক সহজে পাওয়া যায় না।

দশ : বুলবুল রায়চৌধুরী

কয়েক বছর আগের কথা, তখন আমরা সবে মাত্র ইস্কুলে ইংরেজি পড়তে শুরু করেছি। তখন থেকেই আমাদের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন তনয়দা। সব সময়ই জড়োসড়ো হয়ে থাকতাম ভয়ে, লজ্জায়। চলতে-বলতে সব সময়ই মনে হত এই বুঝি কোথায় থেকে যাচ্ছে দোষ-ত্রুটি। তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি তনয়দার প্রকৃতি, মিশতে পারিনি সহজভাবে। এই জড়োসড়ো ভাব কেটে গিয়েছিল কতকগুলি ব্যাপারে। তারই একটা দৃষ্টান্ত দিই।

ক্লাসে একদিন তনয়দা পড়াচ্ছেন আর আমরা সকলে মন দিয়ে শুনছি। হঠাৎ একটি মেয়ের পায়ে ঠেকে গেল খানকয়েক বই। বই পায়ে ঠেকার সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েটি চিরাচরিত প্রথা-অনুসারে ঢিপ করে বইগুলিতে প্রণাম করলে। পড়াতে পড়াতেই এই ব্যাপারটা তনয়দার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সামনেই ছিল স্তূপ-করা কতকগুলি বই, পায়ে ছিল জুতো, মেয়েটিকে বিদ্রূপ করেই তিনি জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে মারলেন লাথি বইয়ের গাদায়। বইগুলি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। সেদিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। আমরা তো সবাই 'থ'। করেন কি, বইয়ের উপর লাথি! ব্যাপারটা ছিল তখন খুবই আশ্চর্যজনক। পড়াশুনা করি না করি, পায়ে বই ঠেকলে প্রণাম করাটা ছিল বিশেষ একটা কর্তব্য। দৈবাৎ যদি পায়ে বই ঠেকে যেত আমরা হয়ে উঠতুম ব্যস্ত। আর উনি কিনা নিজের ইচ্ছায় বইয়ে মারলেন লাথি! ব্যাপারটা চোখে লেগেছিল ভীষণ, রাগও হয়েছিল খুব। কিন্তু মুখে বলিনি কিছু।

বইয়ে লাথি মেরে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বইয়ের পাতায়-পাতায় সরস্বতী বসে নেই। তিনি আছেন মানুষের মনের ভিতর। মন দিয়ে লেখাপড়া করলে, বই-খাতার যত্ন মিলে তবেই পাওয়া যায় সরস্বতীকে।

জানানো যায় তাঁকে প্রণাম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি এই ব্যাপারটা। বুঝেছিলাম আরও কিছু বড়ো হয়ে। সারা বছর খাতায় পেলাম C, D, আর বৎসরান্তে ঘটা করে দিলাম সরস্বতীর পুজো, এ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

তিনি যেন হাতে-কলমে কাজ করে দূর করেছিলেন আমাদের মনের কুসংস্কার। এর পর থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম তনয়দার প্রকৃতি। এর থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, তনয়দা সব সময়ই আমাদের ভালো চাইতেন। সেটা সোজাসুজি বোঝা যেত না। বোঝা যেত ইঙ্গিতে। এর পর থেকেই আমাদের মনের ভয়, জড়তা, কোথায় যেন গেল মিলিয়ে।

এগারো : হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আমাদের ইংরাজি-শিক্ষক শ্রদ্ধেয় তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রিতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

আমি এই অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর, ষষ্ঠ বর্গ হইতে তৃতীয় বর্গ পর্যন্ত, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। তাঁহার নিকটেই আমার প্রথম ইংরাজি ভাষার হাতে খড়ি হয়। এই চারি বৎসরে তাঁহার চরিত্রকে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, সশ্রদ্ধভাবে নিম্নে তাহাই বলিতেছি।

শুনিয়াছি—তাঁহার জন্মস্থান ছিল খুলনা জিলায়। তাঁহার ছাত্রজীবন কুচবিহার বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কাটিয়াছিল। তাহার পরে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন এবং সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর কাল তিনি এখানকার পাঠভবনে অধ্যাপনা কার্যের পর পরলোকগমন করেন।

এইরকম বিচিত্র চরিত্রের অধ্যাপক আমি আর দেখি নাই। ছাত্রেরা তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। ছাত্রগণ তাঁহাকে তনয়দা বলিয়া সম্ভাষণ করিত এবং তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এইখানকার অধ্যাপকগণও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও সমীহ করিতেন। তাঁহার চরিত্রে বাহিরে একটি কঠোর আবরণ ছিল। কিন্তু কয়েকটি ঘটনাতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহার হৃদয় অতি কোমল। ছাত্রদিগকে তিনি নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও ভালোবাসিতেন। কোনো ছাত্রের অসুখ হইলে তিনি তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতেন।

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষুর রোগ ছিল। সেইজন্য তিনি তাহাকে ক্লাসে আসিতে নিষেধ করিতেন এবং চক্ষুর ডাক্তারকে দেখাইয়া তাঁহার নির্দেশ-অনুযায়ী কাজ করিতে বলিতেন। কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়াই

তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কি করিলে ছাত্রটির চক্ষু নিরাময় হইবে সেই সম্বন্ধে ডাক্তারের সহিত পরামর্শও করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্য তাঁহার ভালোই ছিল। আমরা তাঁহাকে বেশি অসুস্থ হইতে দেখি নাই। প্রায় সব দিনই তিনি ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন। ক্বচিৎ দুই-একদিন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত। অযথা ছুটি লওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। কোনো দীর্ঘ ছুটির আরম্ভের দুই-একদিন পূর্বে ও খোলার দুই-একদিনের মধ্যে অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ সাধারণতঃ ক্লাসে পড়াইতেন না। কিন্তু তাঁহাকে আমরা পূর্বোক্ত দিনগুলিতে আরও বেশি করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি।

ইংরাজি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাঙ্গালাও প্রচুর পড়িতেন। সংস্কৃত এবং হিন্দিও তিনি ভালোই জানিতেন। ইংরাজি এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবন্ধশ্রেণীর বই পড়িতে ভালোবাসিতেন। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধই যেন বেশি পড়িতেন—তাঁহার কথাবার্তায় প্রকাশ পাইত। আধুনিক কয়েকজন বাঙ্গালা ঔপন্যাসিকের লেখা তিনি পছন্দ করিতেন না। ক্লাসে সেই সকল লেখকের নামও বলিতেন। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমার দ্বারা তিনি নানাস্থানের শ্লোক আমার বাবার নিকট হইতে লিখাইয়া লইতেন। তাহা ক্লাসে পড়িয়া প্রত্যেককে তাহার (শ্লোকের) অর্থও বুঝাইয়া দিতেন। ইংরাজি ক্লাসে তিনি মাঝে মাঝে বাঙ্গালার চর্চাও করিতেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি তিনি আমাদের ক্লাসে পড়াইয়াছিলেন।

হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে লেখকের প্রশংসা করিতেন। যাহাদের হস্তাক্ষর অসুন্দর, তাহাদিগকে তিনি খুব নিন্দা করিতেন। তাঁহার নিজের হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। টানা লিখিতে তিনি নিষেধ করিতেন।

উচ্চারণ সুস্পষ্ট করিবার জন্যও তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন। নিজের উচ্চারণও তাঁহার অতি সুস্পষ্ট ছিল।

কোনো ইংরাজি শব্দের অর্থ তিনি বাঙ্গালায় বলিয়া দিতেন না। বলিতেন: একই শব্দ নানা স্থানে নানা রকম অর্থ প্রকাশ করে। কাজেই আমি যদি তোমাদের বাংলায় শব্দানুবাদ করে দি, তা হলে ঐ শব্দটি যখন তোমরা অন্য অর্থে পাবে, তখন একটিমাত্র অর্থ জানা থাকলে সেই জায়গার অর্থ হয় তো তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। কাজেই এ-জায়গায় এ-শব্দটি কেমন অর্থ বোঝাচ্ছে তা জেনে রাখ।

ইংরাজি পড়াইবার সময় তিনি বাঙ্গালায় কোনো কথা কহিতেন না। সকল কথাই ইংরাজিতে কহিতেন। আবার যে-সকল স্থানে ইংরাজি না লিখিয়া অথবা না বলিয়া বাঙ্গালা লিখিলে কিংবা বলিলে চলে, সেই সকল স্থানে ইংরাজি লিখা বা বলা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন: আমরা বাঙালী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, কেন আমরা বিনা প্রয়োজনে ইংরেজি বলতে যাব? বাংলা ভাষা কি ইংরেজির চেয়ে ছোটো নাকি?

ইংরাজি Rough-কথাটি তাঁহার অপ্রিয় ছিল। অমুক বিষয়ের Rough খাতা, এই কথাটি শুনিলে তিনি বলিতেন: Rough-কথাটির অর্থ খারাপ। কোনো বিষয়ের খারাপ কাজের খাতা যে আবার থাকে তা তো আমি জানি না। যেদিন আমরা তাঁহার নিকট শেষ ক্লাস করি (১৮ই মার্চ) সেই দিনও আমরা তাঁহার দেহে বিন্দুমাত্র অসুস্থতার চিহ্ন লক্ষ্য করি নাই। সেই দিন তিনি আমাদের বাঙ্গালা হইতে ইংরাজি অনুবাদ করার পরীক্ষা লইয়াছিলেন। এই ক্লাস করার পর দিনই (১৯শে মার্চ) তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং কয়েকদিন পরেই ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রিতে দেহত্যাগ করেন।

যখন আমি খবর পাইলাম যে, তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন, তখন যেন

ঠিক বিশ্বাস হইল না। পরে স্বচক্ষে তাঁহাকে শেষশয্যায় শায়িত দেখিয়া আসিলাম। ভবভূতি উত্তররামচরিতে রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এরূপ শিক্ষাব্রতী, ছাত্রবৎসল এবং নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক দুর্লভ।

বারো : মীনাক্ষী বসু

গত ৯ই এপ্রিল আমরা আমাদের প্রিয় অধ্যাপক তনয়দাকে হারিয়েছি। এই ঘটনার পূর্বে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে, এইভাবে অকালে তনয়দাকে হারাতে হবে। তিনি এখানকার খুবই পুরানো অধ্যাপক। তিনি সকলের নিকট খুবই সুপরিচিত। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা এবং প্রীতির চোখে দেখতেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ভয় করত এবং সেইসঙ্গে ভালোও বাসত।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে ছাত্রছাত্রীরা যাঁকে ভয় করে তাঁকে ভালোবাসতে পারে না। কিন্তু তনয়দার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। তাঁকে সবাই ভয়ও করত আবার ভালোও বাসত। যাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না তাঁরা হয় তো তাঁকে দেখে মনে করতেন যে তিনি খুবই কঠোর এবং গম্ভীর। কিন্তু সেটা তাঁর বাহ্যিক রূপ। তাঁর বাইরেটা হয়তো কঠোর ছিল, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল অত্যন্ত কোমল। নারকেলের ওপরটা কঠিন কিন্তু তার ভেতরে যেমন সুমিষ্ট জল এবং নরম শাঁস থাকে, তনয়দার ক্ষেত্রে ঠিক সেইরকম।

সকল ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি সমান ভাবে ভালোবাসতেন। তাদের জন্য খুবই পরিশ্রম করতেন। কিসে ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল হবে, কি করে তাদের উন্নতি হবে, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। তিনি একাই থাকতেন। এই পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরাই তাঁর নিকট আত্মীয় ছিল। তিনি তাদের প্রত্যেককেই চিনতেন। তিনি পাঠভবনকে অত্যন্ত ভালো-বাসতেন। পাঠভবনের জন্য যখন যেভাবে পরিশ্রম করতে হত তাতেই তিনি রাজী ছিলেন।

১৯২৬ সালে তনয়দা শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি শান্তিনিকেতনকে এত ভালোবাসতেন যে, এই দীর্ঘ ৩২ বছরের মধ্যে কদাচিৎ বাইরে

গিয়েছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। গুরুদেবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর নিন্দা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না।

তাঁকে চেনে না এমন লোক শান্তিনিকেতনে নেই। কারও অসুখ হলে নিয়মিত তাকে দেখতে যেতেন, যেতে না পারলেও খোঁজ রোজই নিতেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় করবার এবং সকলের পরিচয় জানবার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। বস্তুতঃ তাঁর সঙ্গ ছিল শিক্ষার অঙ্গ। তিনি আমোদ-আহ্লাদ খুবই পছন্দ করতেন। পিকনিকে যাওয়ায়, বেড়াতে যাওয়ায় তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। যারা নীচু কাজ করে তাদের হেয় জ্ঞান করতেন না কিংবা নীচু চোখে দেখতেননা। সবাইকেই নাম ধরে ডাকতেন, সবার উপরেই তাঁর দয়ামায়া ছিল। কেউ যদি মুচীকে 'মুচী' ধোপাকে 'ধোপা' বলে ডাকত, তাতে তিনি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হতেন।

তিনি অন্যায় সহ্য করতে পারতেননা। অন্যায় দেখলে তখনই তার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। সহজে কারো সাহায্য নিতে চাইতেন না। তিনি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন। নোংরা তিনি দেখতে পারতেন না। তাঁর বাড়িতে কোথাও এতটুকু নোংরা দেখতে পাওয়া যেত না। তিনি সব জিনিষ সযত্নে গুছিয়ে রাখতেন।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন প্রিয়জনকে হারালাম।

তেরো : সঙ্ঘমিত্রা সেন

শিশুকাল থেকে আমি তনয়দাকে দেখে এসেছি। তিনি অনেকদিন আমাদের পাশের বাড়িতে ছিলেন।

তনয়দা ছিলেন সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু পৃথক। দেখা যেত বেশির ভাগ শিশু ভয় পেয়ে পালাত তাঁর প্রথম দর্শনেই। আমারও অবস্থা ছিল সেরকম, তাঁকে দেখলে বা তাঁর কথা শুনলেই মনে এক সাংঘাতিক ভয়ের উদয় হত, আর আমাদের এই ভয়ের জন্য বকুনি খেত আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা-দিদিরা, কারণ তিনি ভাবতেন যত ভয় শেখাচ্ছে তারাই।

তাঁর একটি কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোটোবেলায় একদিন আমার দাদার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম, আর তাঁকে দেখেই ভয়ে দাদার পিছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমাকে তিনি বলেছিলেন : অত ভয় পাবার কি আছে? আমি কি তোমাকে নুন-জল দিয়ে গিলে খাব? সত্যি তাঁর এই কথার পরেই মনে হল, একজন মানুষকে অত ভয় করবার কি আছে। এর পর থেকেই ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি ভয়টা আমার কেটে গিয়েছিল।

এরপর যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, তখন অনেক সময় তাঁর কাছে আমায় ক্লাস করতে হয়েছে। প্রথমে তাঁকে ক্লাসে ঢুকতে দেখলেই একটু ভয় করত। কিন্তু তার পরেই ভয় কেটে যেত। যদি তাঁর মনোমত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম তাহলে তাঁর খুশির সীমা থাকত না। তাঁর কাছে যারা বহুদিন ক্লাস করেছে তারাই খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছে, তিনি কি-ধরনের মানুষ ছিলেন। আমাদেরও তাঁর প্রকৃতি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

প্রতিদিন ভোরে ক্লাসে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত, যদিও কোনো কথা হত না। ক্লাসে ঢুকেই সকলের দিকে তিনি এমন দৃষ্টিতে

তাকাতেন যেন প্রত্যেকের ভাগ্যে সাংঘাতিক বকুনি আছে। কিন্তু সে-ধারণা ছিল আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। ক্লাসে কেউ কখনও অবান্তর কথা বললে তিনি খুব বিরক্ত হতেন। কোনো রকম ভুল ও ত্রুটি করে ফেললে তিনি খুব বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু সেই বিদ্রূপের মধ্যে দিয়েই বুঝিয়ে দিতেন কোথায় তার দোষ। তাঁর বিদ্রূপ মনে আঘাত দিত। কিন্তু যে তাঁর আসল বক্তব্য বুঝতে পারত, সে মোটেই মনে ব্যথা পেত না। ক্লাসে অনেক সময় তিনি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন করতেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে অত্যন্ত খুশি হতেন। ২৬শে জানুআরি কিসের জন্য পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেটা একবার আমার বোন বলতে পেরেছিল বলে, তিনি তাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন।

তনয়দার বেশ বয়স হয়েছিল। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। মাঝে মাঝে খেলার মাঠেও খেলোয়াড়দের দলে তাঁকে দেখা যেত। সব কাজেই তিনি ছিলেন উৎসাহী। তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমকে খুব ভালোবাসতেন। এই জায়গা ছেড়ে তাঁকে কোনো দিন কোথাও যেতে দেখিনি। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি খুব চেষ্টা করতেন।

কোনো সময় শরীর অসুস্থ থাকলে তিনি সে-কথা কাউকে বলতে চাইতেন না, আর সেজন্য কারো সাহায্যও নিতেন না।

কিছুদিন আগে আমার বোনের কাছে শুনলাম তিনি ক্লাসে বলেছেন যে, তাঁর শরীর অসুস্থ। এর পর দিন থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আর ক্লাস নিতে আসেন নি। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন এবং আবার ক্লাস নিতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা আর সফল হল না। ক্রমশঃ অসুখ বেড়ে গেল। শুনলাম তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই আর দেখতে যেতেও সাহস করিনি। কিন্তু যেদিন শুনলাম, তিনি

আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, সেদিন কত আপসোস হচ্ছিল কেন আগে দেখতে গেলাম না বলে।

এখন রোজই তাঁর সম্বন্ধীয় পুরানো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে। এখন বুঝতে পারি, তিনি মোটেই ভয় করবার মত ব্যক্তি ছিলেন না, বরঞ্চ তার মতন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিই দুর্লভ। আজকাল রোজই সকালে ক্লাসে যাবার সময় মনে হয়, কোনো দিন এই সময়ে তনয়দাকে আর দেখতে পাব না।

চোদ্দো : জয়সিং ধনজী রাঠোর

তোমার নাম কি?

খোকাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

What is your name?

তবু কোন উত্তর নেই।

তুম্‌হারা নাম ক্যা হায়?

মেরা নাম জয়সিং।

কিছুক্ষণ পর সাহস সঞ্চয় করে—

আপকা নাম?

মেরা নাম? মেরা নাম তনয়দা।

তনয়দা?

হাঁ, হাঁ, তনয়দা!

চোদ্দ বছর আগেকার এই স্মৃতি—এখনও বেশ মনে পড়ে। খুব ছোট বয়সেই আশ্রমে এসেছিলাম, বাংলা ইংরাজি কিছুই বুঝতাম না, হিন্দিতে কোনোরকমে কাজ চালাতে পারতাম। একা একা ঘুরে বেড়াই, কারো সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছি না। এমন অবস্থায় তনয়দার সঙ্গে এইভাবে আলাপ হয়। কয়েকদিন থেকে দেখছি সবাই তাঁকে ভয় করে, ক্লাসে বকাবকিও বেশ হয়ে থাকে, তাই স্বভাবতই একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আলাপ করে মনে হল—না! তনয়দা অচ্ছেই হায়।

আমাদের তনয়দাকে নিয়ে এত গল্প আছে যে, একবার আরম্ভ হলে আর শেষ হতে চায় না—সেই খেলার তনয়দা, ক্লাসের তনয়দা, পিকনিকের তনয়দা, রসিক তনয়দার কথা মনে পড়ছে।

আশ্রম-জীবনে শিশুবিভাগের চিড়িয়াখানা একটি বিশেষ আকর্ষণীয় জায়গা।

এখানে চিড়িয়া যত বেশি আর যত সহজে আসে, ঠিক তেমনি সহজে ফুড়ুৎ করে পালাতেও দেরি করে না। তবে যারা দু-রাতের জন্য আতিথ্য স্বীকার করে, তারা ছেলেমেয়েদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। পালা করে রান্নাঘর থেকে অতিথিদের জন্য খাবার আনা হয়। কিন্তু তাতে কারো মন ওঠে না, তাই ধনপতিদা, মাসিমার চোখ এড়িয়ে, নিজের পাতের দুধ, মাছ, মাংস-ইত্যাদি তাদের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে আনা হয়। মনে পড়ে ভীম-নামধেয় কুকুরের মৃত্যু সেদিনকার সেই শিশু মনগুলিকে কি প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল! তার শোকে কতজন যে উপোস করেছিল, কতজন লুকিয়ে কবরের উপর চোখের জল ফেলেছিল।

সেবার প্রচণ্ড গরম। আমাদের অতিথিদের জন্য রাজভোগের বন্দোবস্ত করলেও তাদের রাজপ্রাসাদটি সারিয়ে দিতে পারিনি। জাল গিয়েছিল ছিঁড়ে, মাথার উপর বয়রা গাছ থাকলেও সব সময় তার ছায়া পাওয়া যেত না, আর প্রাসাদ-প্রাচীর বৃষ্টির জলে ক্ষয়ে গিয়ে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল। অনাদরের অভিমানে, অতিথিরা গরমের দোহাই দিয়ে একে একে বিদায় নিচ্ছিল।

সবাই খুব চিন্তিত, কি করা যায়? একটা খুব গম্ভীর সভায় ঠিক করা হল— কাল ছুটি আছে। ঠিক দুপুরে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে তখন গুদাম থেকে খড় চুরি করে আনতে হবে। কয়েকজন থাকবে চিড়িয়াখানায়, কয়েকজন ঢুকবে গুদামে আর বাকি সব রাস্তায় লাইন করে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে চোরাই মাল চালান করতে থাকবে। যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলে তার সঙ্গে কথা বন্ধ, আর কোনো খেলায় তাকে নেওয়া হবে না। যেমন কথা তেমনি কাজ। ঠিক সময় প্রচুর খড় এসে গেল। চিড়িয়াখানার ছাদ যা তৈরি হল, উত্তরায়ণের ছাদও তার কাছে লাগে না।

সবাই বড় আনন্দে আছি, প্রাসাদ দেখছি আর ভাবছি: বাঃ! বেড়ে

হয়েছে। কি চালাক আমরা। কোনো মস্ত বড় ডিটেকটিভ এলেও কাউকে ধরতে পারবে না। হঠাৎ তনয়দার আপিসে ডাক পড়ল। 'বাল্মীকি প্রতিভার' ডাকাতগুলির মুখ এতটুকু, গর্ব চূর্ণ হয়ে গেছে। ডাকের কারণ সবাই অনুমানে বুঝল। সামনে দাঁড়াতেই বকুনির ঝড় শুরু হল : চুরি করতে লজ্জাও করল না? কেন? আমায় বলতে পারলে না তোমরা খড় চাও? তোমাদের সবাইকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব। ···যতক্ষণ না বলি ওখানে চুপ করে সবাই দাঁড়িয়ে থাক। কেউ কোন কথা বলবে না।

দেখি মস্ত বড় একটা চিঠি লিখে প্রভাকরদার হাতে দিয়ে কোথায় জানি পাঠিয়ে দিলেন। পর দিনই প্রাসাদে নতুন জাল এল, সিমেণ্টের পাকা ঘর তৈরি হল, জল রাখার নতুন পাত্র এল, আর প্রাসাদের চেহারা গেল পালটে। কয়েকটি নতুন জাতের অতিথিও দেখা দিল। কিছুদিন পর শিশুবিভাগের জন্য এল জীবজন্তুর নতুন বই, ছবি, খেলনা আরো কত কি? কিছুই ঠাওরাতে পারলাম না—আমরা বকুনিও খেলাম, কাউকে তাড়ালেনও না তার উপর এত সব নতুন নতুন জিনিষ এল। আর তনয়দাই বা কেন রোজ একবার করে অতিথিদের দেখতে যান?

সেদিন ভোরে উঠেই দেখি—বৃষ্টি। কি মজা, আজ আর ক্লাস হবে না। বৈতালিকের সময় দেখি বৃষ্টি প্রায় ফুরিয়ে এল। তা হোক আজ ছুটি পাওয়া চাই। সবাই ভূপিন্দারকে ঘিরে ধরল : আজ ক্লাস হতেই পারে না। এত বৃষ্টি, আর দেরি করেই বা কি লাভ? এগারোটা ঘণ্টা দাওনা বাজিয়ে। আমরা সবাই তারপর তনয়দার কাছে যাব। বেচারী কিছুটা সাহস পেয়ে, কিছুটা ভয়ে ভয়ে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল। সামনে শ-দুয়েক ছেলেমেয়ে ভিজছে আর গুনছে ১।২।৩।৪।৫।৬।৭। যেই না থেমেছে অমনি সবাই মিলে চেঁচাতে শুরু করল ১১টা। ১১টা। আবার শুরু হল ৮।৯।১০

১১। ছুটি! ছুটি! কেউ তাকে ঘাড়ে তুলে নাচল, কেউ বাহবা দিয়ে ছুটল মাঠে—সারা আশ্রম ছুটি।

সব ভবনের অধ্যক্ষরা, শিক্ষকরা তনয়দাকে চেপে ধরলেন: কি মশায়, ছুটি কেন? বৃষ্টি তো থেমে গেছে! তনয়দা তাঁদের কি বল্লেন জানিনা, কিন্তু ভূপিন্দারের কাছে মারমূর্তি হয়ে এলেন: কে তোমায় ছুটি দিতে বলেছে? তুমি কি অধ্যক্ষ, না সচিব, না ছুটি দেবার মালিক? কিছুক্ষণ পর কি ভেবে জানি, ফোকলা মুখে একটু হেসে বললেন: আর কখনও না বলে ১১টা ঘণ্টা বাজাবে না। তুমিই দেখছি আমার জায়গায় অধ্যক্ষ হয়ে দাঁড়ালে।

সেবার পর পর সাতদিন বৃষ্টির জন্য ছুটি পেয়েছিলাম। তনয়দা পড়াবার বেলা ছিলেন যেমন শক্ত, ছুটির বেলা তেমনি ছিলেন সহজ। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে কখনও ছুটি দিতেন না। ছুটিতে lexicon খেলাতেন বা কোনো গল্প বলতেন বা বেড়াতে নিয়ে যেতেন,আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পড়াটা করিয়ে নিতেন।

ক্লাসে, পিকনিকে, ছুটির দিনে প্রায়ই তনয়দা lexicon খেলাতেন। সুন্দর বাতিকের কাজ-করা দুটি চামড়ার বাক্সে থাকত তাঁর lexicon cards, ঝোলার মধ্যে Oxford অভিধান আর থাকত কাগজ পেনসিল। বানান ভুল করলে বা মানে না জানলে খুব রেগে যেতেন, খোঁটা দিতেও ছাড়তেন না। কিন্তু কোনো রকমে তাঁকে হারাতে পারলে যে-কেউ পেট ভরে খাওয়া আদায় করে নিতে পারত। Lexicon তাঁর এক বাতিক ছিল, কিন্তু যতটা না খেলতেন তার চেয়ে বেশি ইংরেজি পড়িয়ে নিতেন। তিনি শুধু যে lexicon-পাগল ছিলেন একথা বললে ঠিক বলা হবে না। মার্বেল, ডাঙগুলি-থেকে ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিনটন সব খেলারই নিয়ম-কানুন ও কলা-কৌশল তিনি যেন একেবারে গুলে খেয়েছিলেন।

পড়ার থেকে খেলাটাকে আলাদা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি এক

ঢিলে দুই পাখি মারতেন— খেলার সঙ্গে পড়াকে অঙ্গাঙ্গী দেখার তাঁর এক আশ্চর্য ধরন ছিল। একদিন পার্থ ক্লাসে দেরিতে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন :

Why are you late ?
I was listening to the relay.
Get in, but don't be late in future.

তারপর ইংরেজিতে তাকে নিয়েই ক্লাসটা শুরু করলেন। আর সবাইকে যোগ দিতে হল—কোথায় খেলা হচ্ছে? কাতে কাতে? সেখানকার আবহাওয়া এখন কেমন? সেখানে কেন এখান থেকে শীত বেশি? ওখানকার রাজধানী কি, প্রধান মন্ত্রীর নাম কি, ইত্যাদি। তাই সব কিছু বিষয়ে খুঁটিনাটি সব খবর রাখতেই হত অথচ সেটাকে আমরা খেলার মধ্যে ধরে নিতাম বলে নিজের অজান্তেই অনেক কিছু শিখে ফেলতাম।

তনয়দার আসরে বসতে পারলে আমরা আর কিছু চাইতুম না। কিন্তু সব জায়গায় দু-একটি নষ্টনীড় থাকে যারা কাউকে জব্দ করতে পারলে বেশ মজা পায়। বিশেষ করে তনয়দাকে জব্দ করতে পারলে আর কি চাই? একবার তনয়দা তাঁর ছেলেবেলাকার কথা বলতে বলতে বললেন : আমাদের trainer খুব কড়া লোক ছিলেন। হাণ্ডবল করলেই হাতদুটি পিছনে বেঁধে দিতেন। অমনি একজন বল্লে : আচ্ছা তনয়দা, আপনারা ফাউল করলে আপনাদের trainer কি করতেন?

ফাউল করলে? ফাউল কাটলেট করতেন।
আমাদের একটা কথাই ছিল :

তেজেশদার গুঁতো পয়সায় দুটো।
তনয়দার গাঁট্টা পয়সায় আটটা।

একটু ভুল করেছ কি গিয়েছ। একবার তনয়দার কাছে আমরা Thackeray'র A Sage in Trouble পড়ছিলাম। তখন mystery আর spin কথাদুটির

মানে আমাদের জানার কথা। সুপ্রিয় ছাড়া ক্লাসে কেউ mystery কথাটির মানে বলতে না পারায়, সবাইকে লাইন করে এক-একটা চড় খেতে হল। তারপরই spin কথাটির মানে সুপ্রিয় ছাড়া অনেকেই বলতে পারল, অমনি তাকে এমন এক গুঁতো মারলেন যে, ঐ নাদুস-নুদুস ছেলেটি টাল সামলাতে না পেরে বারান্দা থেকে ছিটকে পড়ল একেবারে কাঁকরে। আমরা ভাবলাম যাক শোধবোধ হয়ে গেল। আর একদিন farmer মানে চাষা বলাতে সবাইকে চাষা হতে হয়েছিল কারণ চাষীকে অকারণে চাষা বলাটা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু এ-রাগ ছিল তাঁর বাইরের খোলসমাত্র। সেদিন মঞ্জুলাকে বললেন : তোমার নামের বানান ঠিক করে বোর্ডে লিখতে পারবে? সে বুক ফুলিয়ে বলল : পারব! তনয়দাতে আর মঞ্জুলাতে বাজি রইল পাঁচটা রসগোল্লা। শেষে বানান ভুল লেখার বকুনি তো খেলোই উপরন্তু পরের দিনই মিষ্টি আনতে বলে দিলেন। তনয়দা বলেছেন অতএব না নিয়ে গেলে উপায় নেই। পরের দিন ক্লাসে এসেই বললেন : কই আমার বাজি এনেছো? সে একটা ছোট বাক্স খুলে ঠিক পাঁচটা মিষ্টি বের করল। উত্তরে সে প্রথমে পেল Thanks তারপর খোঁটা—কেন? আর আনতে পারলে না? আমি একা খাব আর এরা বসে বসে দেখবে? মাঝখান থেকে পুরো ক্লাস পেটভরে মিষ্টি খেল, মনে মনে সবাই বলল : ভাগ্যিস নামের বানান জানত না!

যারা বই লেখে তারা যে আমাদেরই মতো মানুষ আর তাদের সামনা-সামনি দেখাও যায়, একথা ঐ বয়সে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। ইতিহাস-পরিচয়ে সক্রেটিসের গল্পটা পড়লাম কিন্তু সেটা যে ঐ তনয়দা, যিনি আমাদের সঙ্গে গুলি খেলেন ক্লাস নেন আর পিকনিকে যান তিনি লিখেছেন, সেকথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। বড় হয়ে বীরেশ্বরদা সম্বন্ধে তাঁর লেখা পড়ে সন্দেহ ভঞ্জন হল।

তনয়দাকে কখনও কেউ তাঁর ঐ ছোট্ট সাইকেলটা ছাড়া ভাবতেই পারে না। সকলের কাছে একটা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ঐ সাইকেল। কিন্তু চাওয়া যায় কি উপায়ে? অনেক গবেষণার পর ইন্টারভেলে ওই সেগুন গাছটার চারপাশে ঘুর ঘুর করতে শুরু করলাম কারণ ও সময় ওখানেই উনি বসেন।

ওহে, সাইকেলটা নিয়ে গিয়ে সেবকদার বাড়ি থেকে আমার জন্য পান নিয়ে এসো তো।

আর দেখে কে, কার্যসিদ্ধি! পানটা ছুতোমাত্র, সাইকেল চাপতে দেওয়াটাই আসল কথা।

ক্লাসে তনয়দা মাঝে মাঝে কার্টুন আঁকতেন কিন্তু তিনি যে শিল্পের একজন অনুরাগী সমালোচক, এ-পরিচয় বড় হয়ে পাই। আমি বুদ্ধদেবের একটা বড় বাটিক করেছি শুনে দেখতে চাইলেন। মুহূর্তের জন্য মনে হল আকাশ থেকে পড়লাম বুঝি? তনয়দা আমার বাটিক দেখবেন! এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কি থাকতে পারে? আর তিনি যদি কোনো রকমে ভালো বলেন তার মানে আমি সত্যিই একজন মস্ত বড় আর্টিস্ট। তিনি প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু যখন বোঝাতে আরম্ভ করলেন কোথায় মোমের গণ্ডগোল করেছি, কোন রং দিলে কাজটা আরো খুলত, কি করলে আরো ভালো হত, আর effect টা একেবারে পালটে যেত, তখন আমি তাঁর শিল্প সমালোচকের পরিচয়টা নতুন পেলাম। তাঁর এই পরিচয় খুব কম ব্যক্তিই পেয়েছেন।

তিনি বলতেন, আমি চাকরি ছেড়ে দিলে পর রেললাইনের ধারে একটা বাড়ি করব। তাতে মস্ত বড় একটা বাগান থাকবে। সমস্ত মেঝেটা একটা প্রকাণ্ড শতরঞ্জি দিয়ে ঢেকে দেব। চারিদিকে বই সাজানো থাকবে। তারপর একটা তাকিয়া নিয়ে এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক গড়াব আর খালি

বই পড়ব। কেউ কিছু বললে বলব আমার যেমন খুশি আমি গড়াব আর বই পড়ব। তাঁর নিজের লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই দেখলে পড়ার প্রতি তাঁর ভালবাসা কেমন ছিল বোঝা যায়।

তাঁর আসল পরিচয় প্রথম আলাপে কেউ পেত না। বাইরের খোলসের আড়ালে আসল মানুষটিকে এমন লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রথমে ভুল বোঝাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু একবার যে তাঁর আসল পরিচয়টি পেয়েছে সেই জানে রাগের পিছনে ছিল স্নেহ, কঠিনের ভিতরে সহজ, রুদ্রের আড়ালে শিব। শেষ বয়সে তাঁর এই খোলসটি গিয়েছিল খসে, নিজেকে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হত না, সকল আশ্রমবাসী তাঁর আসল পরিচয়টি ধরে ফেলেছিল। সেই হারই হল তাঁর জিত! তাই আজ আমরা নির্ভয় নিঃসংকোচে বলতে পারি: তাঁকে ভয় করেছি, সমীহ করেছি। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা এই যে, তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করেছি, ভালোবেসেছি।

তনয়দা, না তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ? শান্তিনিকেতন পাঠভবনে আমার অন্যান্য সতীর্থদের কথা জানি না, কিন্তু নিজের কথা বলতে পারি, হীরেনদা, বিভূতিদা, অথবা গোসাঁইজী, মাস্টারমশায় বলে সহজে যেমন ডেকে উঠতে পারতাম, তেমন করে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে কখনোই 'তনয়দা' বলে ডেকে উঠিনি। তবে কি তিনি আমার কাছে তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের মতো একটি নৈর্ব্যক্তিক নাম হয়ে ছিলেন? তাও কখনোই নয়। তিনি আমার একান্ত এবং দিগন্তের মাঝখানে গুরুর মতো একটি নিষ্ঠুর অথচ যথাযথ জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার সমীপ ও সুদূরের মধ্যে বিবেকী ব্যবধান রেখে। তনয়দা সঠিক অর্থে আমার প্রথম গুরু। গুরু শব্দের সম্পূর্ণ অভিধা স্মরণ করেই আমি এ কথা মনে মনে আজ তাঁর সম্পর্কে বারবার উচ্চারণ করছি।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষার 'গ্রন্থব্যবহার-পদ্ধতি' অংশে তনয়দা লিখেছিলেন: 'শিক্ষণপর্ব শুরু করিবার পূর্বেই শিক্ষক মহাশয়ের বাক্যগুলির পর্যায় সম্বন্ধে ভাবনা স্থির করিয়া রাখা দরকার; নতুবা কার্যকালে বিলম্ব-ঘটিত অসুবিধা হইবে। মনে রাখা দরকার যে, আদেশ ও তাহা পালন সত্বর ও স্বাভাবিক হওয়ার উপরেই কাজের সুফল নির্ভর করে।' হাতের কাছে যে-অংশটি ধরা পড়ল, তারি মধ্য থেকে একটু তুলে দিলাম। কিন্তু এই দুটি বাক্যের মুকুরে তনয়দার মুখের ছবি আজ আমার চোখে ভেসে উঠছে। বৈতালিকের প্রার্থনা ও গানের পরেই যতদূর মনে পড়ছে, তনয়দার ক্লাস শুরু হত। একটু দেরি হলেই বুক কাঁপত, তাঁর প্রচণ্ড বকুনি খাওয়ার ভয়ে নয়, 'সমস্ত ক্লাসের ঠাসবুনুনি সংহতি আহত করলাম'— এই ভাবনায়। May I come in? প্রশ্ন করে ঢুকতে হত; এক মুহূর্তে ক্লাসের তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে সমকালীন হয়ে যেতে হত, তা না হলে নিজের কাছে নিজের মুখ দেখানোর উপায় থাকত না।

'উপায় ও লক্ষ্য আমার কাছে সমার্থক'—গান্ধীজীর এই কথাটি পাঠভবনে পড়ার সময়ে বই থেকে জেনে নিয়ে একটুও অবাক লাগেনি বোধহয় এই জন্য যে, শৃঙ্খলা ও ছন্দের অন্যোন্য সম্পর্কের আভাস তার আগেই তনয়দার ব্যবহারে জেনেছিলাম। বলা বাহুল্য শুধু জেনেছিলাম, কিন্তু অনুধাবনের জন্য প্রস্তুত হতে যথেষ্ট সময় লেগেছে এবং লাগবে।

যত সময় গেছে উপরের কথাটিকে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি, আর আজ কথাটা বলবার জন্য পূর্ববিচার করতে হয় না। তাঁকে, আমি অন্ততঃ, শৈশবে একাধিকবার উপর থেকে দেখতে গিয়ে বিড়ম্বিত হয়েছি, ভুল বুঝেছি। তাঁর উদ্দেশ্যের আশ্চর্য সমগ্রতা নিয়ে কোনোদিনই প্রশ্ন তুলিনি, উপায়ের কঠোরতা নিয়ে ভিতরে-ভিতরে প্রতিবাদ করেছি, তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছি। অথচ প্রতিবারেই অনিবার্য আত্মসংশোধনের তীক্ষ্ণ রৌদ্রে আমায় ধরা দিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শিক্ষার আদর্শ হিসেবে কাজ করেছেন, এ কথাটা এতদিন পরে ভালো করে বুঝতে পারি। যখন তিনি তাঁর এই মূর্ত আদর্শের দিকে তাকিয়ে কথা বলেছেন, তাঁকে চিনে নেওয়া যায়: 'রবীন্দ্রনাথের মহিমা তাঁর অবিভাজ্য সমগ্রতার মধ্যে নিহিত। তিনি অসংলগ্ন ভগ্নাংশের জীবন যাপন করেন নি। ব্যবচ্ছেদপ্রথা অবশ্য আজও একটি স্বীকৃত শিক্ষাপদ্ধতি। 'এমন অনেক মানুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে মহৎ মানুষও পাওয়া যাবে, যাঁদের জীবনকে কোনো রকম ক্ষুণ্ণ না করে ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতিতে ধরা সহজ। তাঁদের মহত্ত্ব তাঁদের সত্তার নানা বিকীর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যে বিশ্লেষণ করা যায় এবং প্রত্যেক বিশ্লেষিত পর্যায় নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা চালানো যায়।···কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এ রকম সুবিধাজনক পর্ববিভাগের মধ্যে কিছুতেই ধরা যাবে না। পক্ষান্তরে তাঁর সত্তার একটি ব্যাপকতা আছে, যা তাঁর প্রতিটি স্তরের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে আছে এবং তিনি নিজে প্রতি স্তরেই সমানভাবে বিতরিত, অনুস্যূত।'[১]

১ Visva-Bharati Quarterly Education Number 1947-এ প্রকাশিত তাঁর Rabindranath's Contribution to Education of India প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

এখানে 'অনুস্যূত' শব্দটি 'immanent'-এর স্থলে গৃহীত হয়েছে, তাঁর শিক্ষাদর্শের নীরন্ধ্র, নিরবচ্ছিন্ন ও সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগবিধির কথা মনে রেখে। তাঁর কাছেও অসংলগ্ন ভগ্নাংশের কোনো মূল্য ছিল না, সংলগ্ন অংশেরই তাৎপর্য ছিল। Direct method ছিল তাঁর শিক্ষণপ্রণালী, এবং একটি অখণ্ড পৌর্বাপর্যের বশবর্তী হয়ে সেই প্রণালীটিকে তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতেন। নিজের খরচে ছেপে বা সাইক্লোস্টাইল করে ছুটির কাজ দিতেন এবং তার মধ্যে প্রতিদিনের কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকত। তাঁর ভাষায়: '(ক) একদিনের কাজ (খ) একদিনের কাজ—এমনি করে ২০ দিনের কাজ দেওয়া হল।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বলি, একবার তাঁর নির্দেশ এলোমেলোভাবে অর্থাৎ 'অসংলগ্ন'ভাবে পালন করেছিলাম বলে আমায় তিনি গ্রীষ্মের ছুটির পর নিজে তৎকালীন রেক্টর বিভূতিদার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন: 'রণজিৎবাবুর সেক্‌সনে ওকে পাঠিয়ে দিন, আমার কাছে ওকে আমি রাখতে পারব না।' স্পষ্ট মনে আছে শিশুবিভাগের বারান্দা থেকে লাইব্রেরির বারান্দা পর্যন্ত অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি সেদিকে একবারের জন্য ভ্রূক্ষেপও করেননি। একটি নিয়মী ছন্দ, যার আরম্ভ, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির মধ্যে কোনো ছেদ নেই, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

রেক্টরের পদ ছাড়লেন, পড়ানোর কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে। কলেজে পড়াতে ভালো লাগল না, বরং বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিলেন, ছোটদের পড়াবেন বলে। তাঁর ভাবনার প্রায় সমস্ত জায়গা দখল করেছিল তৃতীয় বর্গ বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা, যাদের প্রত্যেককে তিনি নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে দেখতেন, যাদের কাছে ক্লাসের মধ্যে তিনি প্রশ্নের পরিমিত অথচ সুষ্ঠু জবাব আশা করতেন এবং পিক্‌নিকে গিয়ে ঝুলি থেকে লেক্সিকনের কার্ড বার করে প্রত্যেককে দু-হাতে দ্রুত তাদের শব্দভাণ্ডার উজাড় করতে প্রবুদ্ধ করতেন।

একটি চিঠি থেকে বোঝা যাবে, এটা শিক্ষার্থীর দিক থেকে না হলেও তাঁর

দিক থেকে কি রকম সর্বক্ষণের কাজ ছিল, জাগরণে ও নিদ্রায়: 'লিখতে লিখতে চোখ তুললে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে একেবারে ফাঁকা। হিতেনবাবুর বাড়ির উত্তরের বারান্দা। এমন করে বসেছি যে একেবারে নাক বরাবর তিব্বত, রুশস্বর্গ ও শেষকালে Laxness-এর দেশ ভেদ করে দিব্যদৃষ্টির অভিযান হতে পারে। আসলে কি জানেন— আপনারা সুবর্ণরেখার ধারে ঘাটশিলায় যে আনন্দবাজার খুলেছেন, আমি লালবাঁধের দক্ষিণপাড়ে উত্তরপশ্চিম-মুখো বসে তার চাইতে যে কম আনন্দে নেই, শব্দ দিয়ে সেই ছবি এঁকে আপনাদের দৃষ্টিগোচর করতে চাচ্ছি। বারমেসে বাড়ির যে-কোনো স্থানে বসে নাকটাকে একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ব্যাসার্ধকে ছোটোবড়ো করলেই যে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ হয়—এ কথা বললে লোকে কথায় বলে 'তা বই-কি' 'তা বই-কি', কিন্তু মনে মনে বলে 'ভাঙে তবু মচকায় না।' 'নেই মুরদ, কেবল কথায় দড়'। মনে মনে বলা কথার সঙ্গে লড়াই চলে না। আজ বিশেষ করে যে-আনন্দে হৃদয় উদ্বেল, সেটা এখন বলি। তিন সপ্তাহ ধরে খুঁজে পাইনি, আজ সকালেই হঠাৎ পেয়েছি—সংশোধিত শ্রুতিশিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র। বাড়ি-বদলের পর কোথায় কি রেখেছিলাম কিছুই মনে করতে না পেরে কি অসম্ভব খোঁজার পর্ব উদ্‌যাপন করেছি তা কাউকে বলে বোঝান যায় না। পরশুদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে বেশ কয়েকবার চমকে চমকে উঠেছি।'

এই চিঠির শিরোনামা ছিল 'চা খাবার সময় পড়বেন' এবং চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদ জুড়ে প্রাতঃকালীন ছুটি যাপনের আনন্দ। কিন্তু বিশেষ করে যে-আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হল তার সঙ্গে তাহলে সেই বিশেষ ছুটির সকালের যোগ প্রধানত ঐ শ্রুতিশিক্ষার পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়ার সূত্র, যার অভাবে রাত্রির ঘুমের আরামটুকুও ব্যাহত হয়! শিক্ষাবৃত ও শিক্ষাব্রতী শব্দদুটির পার্থক্যে অবহিত হয়ে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার দলিল সামনে রেখে বলছি: তনয়-দা বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে অন্যতম একজন।

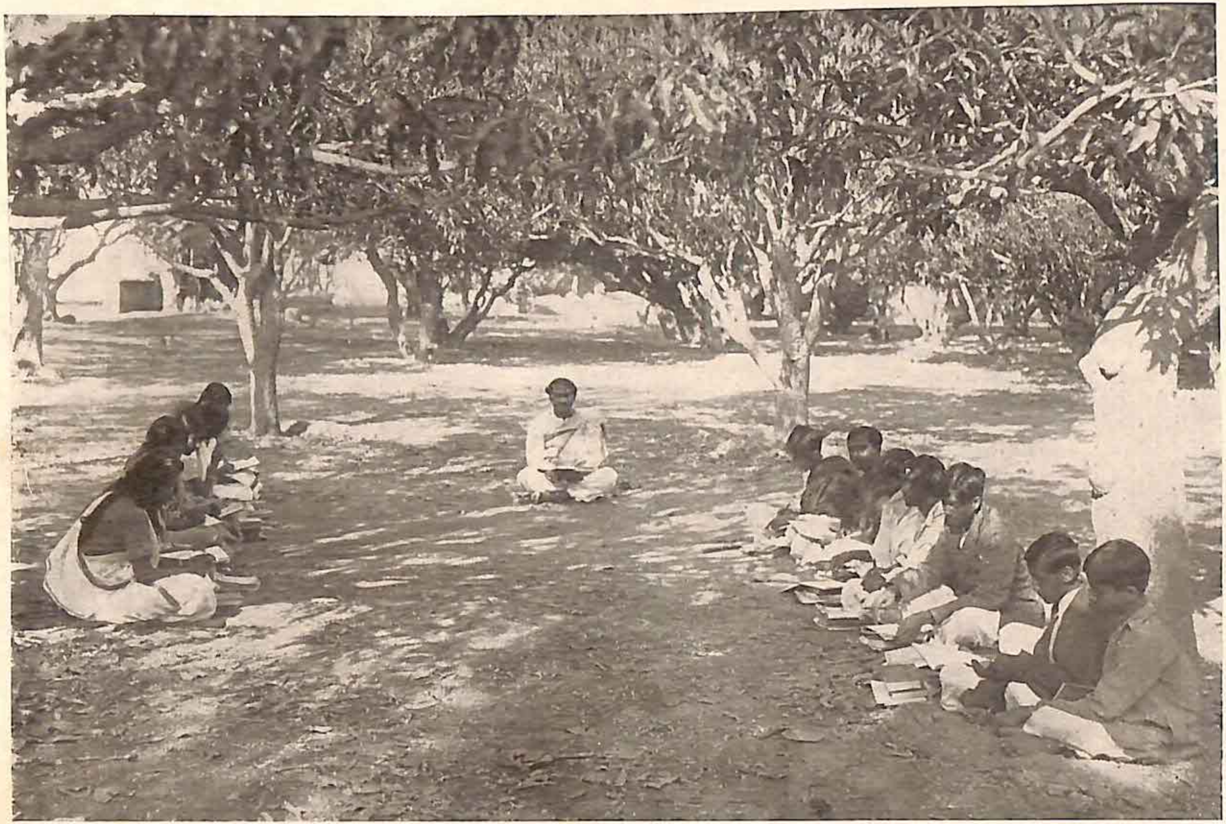
ছোটদের লেখা আর আঁকা অপরিবর্তিত অবস্থায় ছাপা হোক, এই আগ্রহে তিনি 'আমাদের লেখা' বলে যে-বার্ষিকীর সূচনা করে গিয়েছিলেন, তার গত সংকলনের উৎসর্গ-পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করছি : 'শান্তিনিকেতন-পাঠভবনের শিশু-শিক্ষার্থীদের রচিত লেখা ও ছবি সর্বপ্রথম নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। 'আমাদের লেখা' নাম তাঁরই দেওয়া। শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ সমিতির প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি এর সদস্য ছিলেন। এই বার্ষিকী তাঁর স্মরণে উৎসর্গীকৃত হল।'[২] এদেরি জন্য তিনি ইতিহাসপরিচয়ের, ও সহজ পাঠের নানা সংকলনে কয়েকটি গল্প লিখে গিয়েছেন। 'জয়তিলক' গল্পের শেষ দিক থেকে একটুখানি এখানে উদ্ধৃত করছি : 'রাতে ঘুম নেই, দিনে ভাবনার আর পার নেই। খাওয়া কমে গেছে, দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি কিছুই আর নেই। শরীর রোগা হয়ে গিয়েছে, বাপ-মার হয়েছে ভাবনা। তাঁরা তো কিছুই জানেন না, ও তো কাউকে কিছু বলেনি। দিনের পর দিন সেই ঝরনার জলের ধারে বসে থাকে ; একবারের পর আর-একবার, তারপর আবার একবার গুনেই চলেছে। সে-গোনার আর শেষ নেই। কোনো রকম একটা দাগ কি বাড়বে না, একটা ছোটো দাগ, এতদিন চোখে পড়েনি এমন একটা। ঝরনার জল তো একেবারে কাঁচের মতো, এতটুকু ঢেউ নেই, একটু ঘোলাও নয়, তবু একটাও নূতন দাগ ধরা পড়ল না।' তনয়দার স্টাইল ঝরনার জলের মতো স্বচ্ছ, এবং ঝরনারই মতো একসঙ্গে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী।

'অলোক আমায় শ্রদ্ধা করবে না ছাই, ও আমার শ্রাদ্ধ করবে'—আমার উপরে কি-একটা কারণে ভীষণ রেগে গিয়ে একদিন তনয়দা এই কথাটা আমার মাকে বলেছিলেন। কেন জানিনা, ৩রা বৈশাখে তাঁর পারলৌকিক কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পরপর দুখানি চিঠি আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু

---

২ আমাদের লেখা, শান্তিনিকেতন পাঠভবন বার্ষিকী : ১১

সে-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারিনি বলে এখন নির্ভয়ে বলতে পারছি যে, তনয়দার সেই নির্মম নাটকীয় পরিহাস আমার জীবনে ফল্‌ল না।



তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনারত। ১৯২৬?

খুব ছোটবেলায় প্রথম যখন স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছি তখন দু-এক বছর তনয়দার কাছে ক্লাস ছিল না আমাদের। উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা গর্ব করে বলতেন: আমাদের আজ তনয়দার কাছে ক্লাস। শুনে শুনে আমাদের মনে হত কবে আমরা তনয়দার ক্লাসে যেতে পারব। তনয়দা তখন আমাদের পাড়াতেই থাকতেন গুরুপল্লীতে। দেখতাম তিনি সাইকেলে যাতায়াত করছেন।

ঠিক মনে নেই, বোধহয় যখন সিক্স্থ ক্লাসে পড়ি তখন এলাম তনয়দার ক্লাসে। সেই থেকে ম্যাট্রিক দেওয়া পর্যন্ত প্রায় সব ইংরেজি ক্লাসই তনয়দার কাছে করেছি।

সেই ছোটবেলা থেকেই তনয়দার কাছে ক্লাস করতে যেমন ভালো লাগত ভয়ও করত ঠিক তেমনই। নিচু ক্লাস থেকেই ক্লাসের সব ছেলেমেয়ের খাতা, পেনসিল, বই, নোটবই প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিস সম্বন্ধে তনয়দার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। সব কটি জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই এবং এইগুলি রোজ ঠিক মতো ক্লাসে আনা চাই। কোনোদিন কিছু আনতে ভুল হলে আর উপায় ছিল না। এমন বকুনি দিতেন যে ভবিষ্যতে আর ভুল হত না কোনোদিনও। সেই জন্য ওঁর ক্লাস সম্বন্ধে আমরা সব সময়েই সাবধান থাকতাম যাতে কোনো ক্রমেই কিছু না ভুল হয়ে যায়। টাস্ক—সে তো না করে ক্লাসে যাবার সাহসই হত না। তারপর খাতা, বই, নোটবুক--এ সবের কোনোটাই কখনো ভুলে ফেলে আসা চলত না। তনয়দার ক্লাসে বরাবর একটা নোটবুক নিয়ে যেতে হত—যখনই কোনো নতুন শব্দ পাওয়া যেত যেটা আমাদের টেক্স্ট বুকের বাইরে, সেটার নানা রকম প্রয়োগ ও অর্থ নোটবুকে লিখিয়ে দিতেন, আর সেটা শিখে আসতে হত। শিখতে ভুল করলে ভারী রাগ করতেন তিনি।

নিয়মের কড়াকড়ি যতই থাকুক না কেন, ক্লাসের পড়াটা অত্যন্ত ভালো লাগত সেই নিচু ক্লাস থেকেই, আর তা ছাড়া মজাও ছিল নানা রকমের। তনয়দা ভালো ভালো ইংরেজি গল্পের বই থেকে, পড়ে শোনাতেন মাঝে মাঝে। খুব নিচু ক্লাসে সহজ বই থেকে তারপর উপরের ক্লাসে বড় বড় লেখকদের লেখা থেকে পড়ে শুনিয়েছেন। সে যে কি আনন্দ ছিল আমাদের কি বলব! যেখানটা বুঝতে পারতাম না আমরা, জিজ্ঞাসা করতাম, বুঝিয়ে দিতেন। এইরকম একটা গল্প শোনাতে শোনাতে একবার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন: তোমরা বুঝি মনে করো স্নেহ বা ভালোবাসার বাইরে প্রকাশ না থাকলে সেটা ভালোবাসাই হল না? ভালোবাসা তো বাইরে দেখানোর জিনিস নয়, মাপবারও জিনিস নয়। যদি কেউ ভালোবাসা মাপতে পারে তা হলে সে পৃথিবীতে একটা নতুন কাজ করবে।

আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম না, মনে হয়েছিল এটা বোধ হয় ওঁর নিজেরই কথা। কি ভয়ানক পরিশ্রম করতেন আমাদের প্রত্যেকের জন্য, কত স্নেহ ছিল তাঁর ছাত্রছাত্রীর জন্য, অথচ বাইরের ব্যবহারে কখনো তা প্রকাশ করতে চাইতেন না।

আর একটা মজার ব্যাপার ছিল এই যে, যদিচ তনয়দা মুখে মিষ্টি কথা খুব বেশি বলতেন না, লোকের কোনো ত্রুটি পেলে ছেড়েও দিতেন না, তবু তাঁর সঙ্গে গল্প করতে আমরা ভালোবাসতাম খুবই। কোনো পিকনিকে তনয়দা আমাদের সঙ্গে গেলে নানান রকম গল্প ও খেলাধুলায় আনন্দের উপভোগ পূর্ণমাত্রায় হত। তখনকার দিনে প্রায়ই তনয়দা দাদুর গুরুপল্লীর বাড়িতে আসতেন, তা ছাড়া অন্য অন্য জায়গাতেও তাঁর সঙ্গে দেখা হত। দেখতাম তনয়দার সঙ্গে গল্প করতে সকলেই ভালোবাসতেন। তাঁর গুণগ্রাহী ও বন্ধুর সংখ্যা বরাবরই খুবই বেশি। কিন্তু বাইরের ব্যবহারে কোনোরকম আতিশয্য তনয়দা কোনোদিনই পছন্দ করতেন না।

আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে, টেস্টের পরে দু-তিন মাস তনয়দা আমাদের নিয়মিত ভাবে তাঁর মুকুটঘরের বাড়িতে ক্লাস নিয়েছেন, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। ইংরেজি পাঠ্য বই আমাদের ক্লাসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তনয়দা এই দু-তিন মাস কি পরিশ্রম আমাদের জন্য করেছিলেন, তাই ভাবি। এক-একদিন রাত বেশি হয়ে যেত পড়াশুনা শেষ হতে হতে। তখন আশ্রমের ইলেকট্রিক আলো নিবে যেত রাত সাড়ে দশটায়। তনয়দা উঠে লণ্ঠন জেলে দিতেন। তারপর বাড়ী ফেরার সময়ে কোনো দলকে লণ্ঠন কোনো দলকে বা টর্চ দিয়ে দিতেন। দু-তিন মাস ধরে ঠিক এই নিয়মে পড়াশোনা চলেছে, কোনোদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি। অথচ কখনো কেউ সাহস পায়নি তনয়দাকে বলতে: আপনার বেশি পরিশ্রম হচ্ছে না তো? অবশ্য বলার বয়সও তখন আমাদের ছিল না, আর থাকলেও কোনোদিন যে তনয়দাকে সে কথা বলার সাহস হত না, এ কথা নিশ্চিত। ঠিক এই ভাবে তিনি প্রতি বছরই পরীক্ষার্থী দলকে নিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ক্লাস করতেন। এত স্নেহ ছিল তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর জন্য, অথচ তা কখনও প্রকাশ করতেন না।

তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তিনি পড়াশোনায় নিয়মানুবর্তিতা তো চাইতেনই, আরও চাইতেন যেন তাদের চলা, ফেরা, বাইরের ব্যবহার ভদ্র হয়, আতিশয্য-বর্জিত হয়। এই জিনিষটা তিনি আমাদের ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে সর্বত্র শেখাতে চেষ্টা করেছেন। ক্লাসের পড়াশোনা ছাড়াও কত ছোটখাটো খুঁটিনাটি জিনিষ যে তাঁর কাছে আমাদের শেখা, এখনও প্রতি পদে তা মনে পড়ে।

তনয়দা যখন মুকুটঘরে থাকতেন তখন শিশুবিভাগের দেখাশোনার ভারও তাঁর উপরেই ছিল। আমরা যখন ম্যাট্রিকের আগে সন্ধ্যা বেলা তাঁর কাছে ক্লাস করতে যেতাম, দেখতাম ছোটরা কিন্তু বড়দের মত মোটেই ভয় পাচ্ছেনা

তাঁকে। অসংকোচে এসে তাদের নালিশ আপত্তি তাঁকে জানিয়ে যাচ্ছে। তিনি দরকার মতো যাকে যা বলার শাসন করছেন, আদর করছেন। মাঝে মাঝে দেখেছি কোনো বড় ঝগড়াঝাঁটির পরে লজেন্স-টজেন্স দিয়ে মিটমাট করে দিচ্ছেন। ছোটদের এইসব নালিশ প্রভৃতির গোলমালে কখনও তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি।

তনয়দার কথা লিখতে বসে কত কথাই যে মনে পড়ে। আমাদের পাঠভবন জীবনের সমস্ত স্মৃতির সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছেন। গুরুপল্লীর রাস্তা যেখানে শিশুবিভাগের কাছে এসে পড়েছে—সেইখানে, বটগাছের তলায় দিনের পর দিন তাঁর কাছে ক্লাস করেছি। যদিও অনেক দিন হয়ে গেল তবুও মনে হয় না সেই দিনগুলি পুরানো হয়ে গেছে। তনয়দা আর নেই—একথা যেদিন শুনলাম বিশ্বাস করতে পারিনি, বিশ্বাস আজও হয় না। মনে হয় ওই বটগাছের তলায়, না হয় শিশুবিভাগের বারান্দায়, নয় তো কারমাইকেল বেদীর উপর নিশ্চয় তাঁকে দেখতে পাব—ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্লাস করছেন।

তনয়দা চলে যাওয়ার পরে আশ্রমে আর যাওয়া হয়নি আমার—হয় তো বা সেই জন্যই পুরানো ছবিটাই চোখের সামনে ভাসে—দুপুরে ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে, গুরুপল্লী থেকে ছুটে আসছি আমরা দুজন—মিনু আর আমি, বই, খাতা, আসন সব আছে হাতে। দেরি হলে বকুনি খাব তো। প্রথম ঘণ্টায়ই তনয়দার ক্লাস যে!

সতেরো : শ্রীনিরঞ্জন সরকার

বিশ্বভারতী পাঠভবনের অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে পরলোক গমন করেছেন। শান্তিনিকেতনের সমাজজীবনে এই সুদীর্ঘকাল তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। অধ্যাপনা তাঁর নিকট জীবিকামাত্রে পরিণত হয় নি, অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ব্রত উদ্‌যাপনের নিষ্ঠা নিয়েই তিনি শিক্ষাদানের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের মর্যাদা এবং গুরুত্ব ছিল গবেষণা বা শিল্পসাধনারই সমতুল্য। মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপক একদিন কোনো প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে পাঠভবনে পড়াতে গিয়ে তাঁর নিজের পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তনয়েন্দ্রনাথ উক্ত অধ্যাপকের এই উক্তিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শিশুদের শিক্ষকতা তাঁর মনের ঔৎসুক্যকে কখনো ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে নি। বস্তুতঃ তাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে কত বিচিত্র বিষয় ও বস্তু সম্বন্ধে তাঁর মনে ঔৎসুক্য জেগেছে। সে ঔৎসুক্যের পরিসমাপ্তি শুধু পল্লবগ্রাহী জ্ঞানাহরণে কোনোদিন হয় নি। তাই স্কুলের শিক্ষকতায় নির্দিষ্ট কর্মপন্থার দিনের পর দিন পুনরাবৃত্তির ফলে শিক্ষকের মননবৃত্তির জড়ত্ব যে অনিবার্য এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না।

শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষকতায় তনয়েন্দ্রনাথ নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের তৃপ্তিই যে শুধু ছিল তা নয়, এতে ছিল তাঁর আনন্দ। তুলির প্রতি টানে যখন রূপ এবং ভাব আকার গ্রহণ করতে থাকে তখন শিল্পীর যে আনন্দ, সেই আনন্দের আস্বাদ তিনি পেতেন যখন তাঁর চেষ্টার ফলে কোনো শিশুর মন জেগে উঠ্‌ত, বুদ্ধি পরিণতির পথে অগ্রসর হত। তাই তিনি কখনো শিক্ষাক্ষেত্রের তথাকথিত উচ্চস্তরে শিক্ষকতার সুযোগ অন্বেষণ করেন নি। এমন-কি শান্তিনিকেতনের কলেজ বিভাগে

যখন এক সময় জোর করেই তাঁকে কিছু কাজ দেওয়া হয় তখন অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করে তার থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন। শিক্ষকতায় এমন গৌরব বোধ, এমন পরিপূর্ণ আনন্দ, এমন সার্থকতাবোধ জীবনের প্রতি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্লাবনের দিনে সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। যে সমাজ অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রা জড়বুদ্ধির অক্ষমতা বলে গোপনে উপহাস করে না সে সমাজে এই মনোভাব রক্ষা করা সহজ।

'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তনয়েন্দ্রনাথ বলছেন—"প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়তার উপর। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটি পর্বের প্রতি মুহূর্তে তাঁর উদ্দীপ্ত চোখের দৃষ্টি ছাত্রদের মুখে চোখে কিরকম পরিভ্রমণ করে বেড়াত তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনো ভুলতে পারবেন না। সে দৃষ্টিতে একদিকে যেমন প্রকাশ পেত তাঁর ব্যাকুলতা আলোচ্য বিষয়ে ছাত্রদের পরিপূর্ণ মনঃসংযোগ সম্বন্ধে, অপর দিকে প্রকাশ পেত এমন একটি সকরুণ ভাব যার স্নেহতাপে প্রত্যেক ছাত্রের নিগূঢ় মনন শক্তি বিগলিত হয়ে তার জিজ্ঞাসাকে অনর্গল করে দিত।" শিক্ষকের এই রূপটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই আদর্শেই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাসে এই রকমই সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকতে তাঁকে আমরা দেখতাম। বয়স তাঁর এই সক্রিয়তার বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারে নি। আর তাঁর মধ্যে সেই ব্যকুলতাই দেখেছি আলোচ্য বিষয়ে ছাত্রদের পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াসে। ক্লাসের বিষয়ের সীমারেখাকে কখনো তিনি অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকার করতেন না। ছাত্রছাত্রীর মনকে সজাগ এবং বুদ্ধিকে সক্রিয় করে তোলাই তিনি তাঁর কাজের প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাদের মনে জিজ্ঞাসা ও অসংকোচ প্রকাশের প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তোলবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে যেতেন। ভাষার শিক্ষক তিনি, কিন্তু ক্লাসে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা

টুকিটাকি তাঁর পাঠনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ত। অবশ্য যে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষা এখনো সম্পন্ন হয় তাতে শিক্ষার্থীকে তার সহজ অবস্থায় পাওয়া বা তার জিজ্ঞাসা ও প্রকাশের প্রবৃত্তিকে মুক্ত করা অনেক সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। কিন্তু এ বিষয়ে ফলের স্বল্পতা বা ব্যর্থতা মাঝে মাঝে তনয়েন্দ্রনাথকে নিরাশ করলেও, এই প্রয়াসের সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কখনো ক্ষীণ হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁকে আমরা শিক্ষাদানের উদ্যোগপর্বে অক্লান্ত অরিশ্রম করতে দেখেছি। পাঠ পর্যায়ের অন্তর্বর্তী কালে পরের দিনের কাজের প্রস্তুতির জন্য নিয়মিত পরিশ্রম তো তিনি করতেনই, দীর্ঘ অবকাশগুলির অধিকাংশও তাঁর ব্যয় হত এই কাজে। এতে তাঁর বিরক্তি ছিল না, ক্লান্তি ছিল না। পাঠরচনা কালে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের নাম, চরিত্র, ব্যক্তিগত ক্রিয়া কলাপের বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখের সামনে যেন ছবির মতো ভেসে উঠত। তাদের এইভাবে চোখের সামনে রেখেই তাঁর পাঠ তিনি রচনা করতেন। আর অবকাশের অন্তে একই উদ্যোগে সহকর্মীরূপে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন অসুস্থতার জন্য শয্যাগ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তখনো ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মনে কি ব্যাকুলতাই না দেখেছি। নিজের শরীরের অক্ষমতায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আবার এর মধ্যেই যেদিন একটু সুস্থ বোধ করেছেন তাঁর অনুপস্থিতি-জনিত ক্ষতির পূরণ কিভাবে করবেন তারই পরিকল্পনা করেছেন, আমাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

Freedom and Discipline প্রবন্ধে তনয়েন্দ্রনাথ একস্থানে বলছেন: Infinite patience, no humbug about prestige, a serene disposition quietly to explore the complexes of the growing mind, and a never-failing resourcefulness to hit upon the

right occasion of applying the soothing balm of sympathetic understanding when the entire youthful mind is groaning under the piling little acts of injustice 'real or imaginary— these are the keys that will open the priceless caskets, that are the hearts of the young. শিক্ষকের আদর্শ সম্বন্ধে এ যে শুধু তাঁর কল্পনা তা নয়, এই আদর্শকে তাঁর নিজের জীবনে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা আমরা দেখেছি। স্নেহ এবং সহানুভূতি ছিল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের মূল সুর। যাদের শিক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেছেন তাদের সমগ্রভাবে জানা—শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, তাদের চিত্তবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ সংবাদ রাখা, তিনি তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। আর ছেলেমেয়েদের সমগ্রভাবে জানতে হলে, তাদের হৃদয় ও মনের দুয়ার খুলতে হলে যে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশটি জানা এবং সম্ভব হলে তাদের পরিবারের সঙ্গেও একটি সৌহার্দপূর্ণ সম্বন্ধ গড়ে তোলা দরকার একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই ক্লাসের গণ্ডীর মধ্যেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ থাকত না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাদের দেখতে চাইতেন, জানতে চাইতেন। তাই প্রৌঢ় তনয়েন্দ্রনাথকে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শিশুদের আবাসগৃহের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষচ্ছায়ায় তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্বেল খেলতে বা লাট্টু ঘোরাতে দেখা যেত, কিম্বা শীতের মধ্যাহ্নে গৌরপ্রাঙ্গণে বালকদের সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি বা ক্রিকেট খেলতে দেখা যেত। আবার দেখা যেত বনভোজনের দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান উৎসাহে তিনি তরকারী কুটছেন, নদী থেকে জল বয়ে আনছেন, পরিবেশন করছেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে তিনি ভালোবাসতেন। শেষ পাঁচছয় বৎসর বাদে বরাবর তিনি তাদের সঙ্গেই একত্রে খেয়েছেন। তাদের খেলার কোন প্রতিযোগিতায়, সাহিত্যসভায় বা অভিনয়ে দর্শক হিসাবে 'তনয়দা' উপস্থিত নেই এরকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার এই আগ্রহ, জীবনের নানাক্ষেত্রে তাদের দেখবার এই ইচ্ছা তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল একথা সত্য। এটি কিন্তু শিক্ষক বৃত্তিতে সাফল্যলাভের একটি কার্যকর কৌশল মাত্র ছিল না। শিশুদের প্রতি স্নেহ ছিল তাঁর হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই স্নেহে ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। সেজন্য সবকিছুতে ছাত্রছাত্রীদের পিঠ চাপড়িয়ে তাদের প্রিয় হবার চেষ্টা তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। অন্যায় দেখলে, ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখলে কঠোরভাবে তিনি তিরস্কার করেছেন। আবার কেউ কোনো বিষয়ে একটু ক্ষমতার পরিচয় দিলে, চারিত্রিক মহত্ত্বের পরিচয় দিলে অকৃত্রিম খুশিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ঠিক ভয় না করলেও তাঁর সম্পর্কে সম্ভ্রম বোধ করত সর্বদাই, আর তাঁকে না হলে তাদের কোনো অনুষ্ঠানই যেন জমতে চাইত না।

ছেলেমেয়েদের কেউ কোনোদিন তনয়েন্দ্রনাথের কাছে 'অপদার্থ' বলে গণ্য হয় নি। সকলে একই প্রকার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। যার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেগুলির পূর্ণবিকাশের সহায়তা করাই প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের এই অভিমতে তনয়েন্দ্রনাথের মনের পুরোপুরি সায় ছিল। দস্তুরে-বাঁধা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা দেখাতে যারা ছিল যে-কোনো কারণে অক্ষম তাদের প্রতি তনয়েন্দ্রনাথের বিশেষ একটি মমতা ছিল। এদের জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করতেন। শুধু ক্লাসে নয়, তার বাইরেও নানা ভাবে এদের সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। খেলাধূলায় সভাসমিতিতে যে-সব ছেলেমেয়ে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিত, সমাজ জীবনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানা পরিশ্রমসাধ্য কাজে যারা হাসিমুখে এগিয়ে আসত, তারা সবাই ছিল তাঁর প্রিয়। আর এসবের মধ্যেও যাদের প্রাণের আবেগ নিঃশেষিত হত না, দেখা দিত দুষ্টুমির বিচিত্র রূপ নিয়ে, সেই সব দুরন্ত ছেলে-মেয়ের প্রতিও তাঁর স্নেহ ছিল স্বতঃ উৎসারিত। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের

ইতিহাসে এমন দিন অনেক গিয়েছে যখন প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষকগণের অনেকেই এজন্য তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছেন। মনে করেছেন এই সব ছেলেমেয়েদের তনয়েন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়ে এরা অন্য কাউকে গ্রাহ্য করতে চায় না। প্রশ্রয় তিনি দেন নি কোনোদিনই। এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো মসীময় চিত্রও তাঁর মনে স্থান পায় নি। এদের উদ্দাম প্রাণ প্রবাহের উচ্ছলিত ধারা কোথাও কখনো আবর্ত সৃষ্টি করেছে কিন্তু তাঁর সস্নেহ স্বচ্ছ দৃষ্টি শুধু সেইটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। এদের চরিত্রে মহৎ যা কিছু তা তিনি দেখেছেন, অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছেন এরা একদিন ভদ্র হবে, কর্তব্যপরায়ণ হবে, দায়িত্ববোধে উদ্‌বুদ্ধ নাগরিক রূপে সমাজে স্থান গ্রহণ করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বিচারে যে ভুল হয়নি ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

শান্তিনিকেতনে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের শিক্ষাদান ব্রতে তনয়েন্দ্রনাথকে আমরা খুব অল্পই বাইরে যেতে দেখেছি। এই কাজে যোগ দেবার পর থেকে শান্তিনিকেতনই তাঁর দেশ, শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরাই তাঁর আপনার জন হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সুনামে তিনি আনন্দিত হতেন, গৌরব বোধ করতেন। এর নিন্দার কোনো কারণ ঘটলে ব্যথা পেতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা কবির এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁর কাছে প্রিয় করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণপর মনে, ব্যক্তিত্বের বা প্রতিভার তীব্র দ্যুতিতে অভিভূত হয়ে অন্ধভক্তি-লালনের স্থান ছিল না। মনুষ্যত্বের যে-রূপটি রবীন্দ্রনাথে রূপায়িত, তনয়েন্দ্রনাথের মনের গভীরে অঙ্কিত মানবমহত্ত্বের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। শিক্ষার যে-আদর্শ রবীন্দ্রনাথ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন, সে আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টায় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন তা তনয়েন্দ্রনাথের প্রকৃতির অনুকূল মননের সুসদৃশ ছিল। এখানকার শান্তি, অবারিত প্রান্তর,

উদার আকাশ, ছাত্রছাত্রী ভৃত্য কর্মী গুরু এবং গুরুপরিবার সকলকে নিয়ে স্নেহ শ্রদ্ধা সহযোগিতার একটি ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান তনয়েন্দ্রনাথকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল। বিচিত্র সৌন্দর্যের ও আনন্দের স্বতঃ উৎসের ধারার সন্নিকটে শিশুকে স্থাপন করে তার চিত্তকে রসসিক্ত এবং রুচিকে মার্জিত করে তোলার যে ব্যবস্থা, নিছক পঠন-পাঠনকেই শিক্ষা জ্ঞান না করে বিবিধ উপায়ে শিশুর বিভিন্ন শক্তিকে পরিপুষ্ট করবার যে প্রয়াস, শিশুকে সজীব সত্তা হিসেবে বিশেষ একটি ব্যক্তিরূপে গণ্য করবার যে প্রবৃত্তি এখানে তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত সামঞ্জস্য ছিল। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষককে যে মর্যাদা দিয়েছেন, বিবিধ পরীক্ষার এবং পরিকল্পনায় যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর সমগ্র বিদ্যালয়ে সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের মতামতের যে মূল্য দিয়েছেন তাতে শিক্ষক হিসাবে তাঁর সকল শক্তির একটি সহজ বিকাশলাভ সম্ভবপর হয়েছে, তাঁর আত্মপ্রত্যয় বর্ধিত হয়েছে; কোনোদিন তিনি (বা তাঁর সমপ্রাণ সমকালীন কেউ) শিক্ষাদানের দম-দেওয়া যন্ত্রে পরিণত হন নি—নিজের স্বভাবেই নিজে সার্থক হতে পেরেছেন।

তনয়েন্দ্রনাথের মনের ঔৎসুক্য চিরদিন শিশুমনের মতোই সজীব ছিল। নূতন কোনো লোক, নূতন কোনো বস্তু তাঁর জিজ্ঞাসু মনে সহজেই সাড়া জাগাত। প্রকৃতি-প্রীতিও তাঁর ছিল অসাধারণ।

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ছিল—গম্ভীরপ্রকৃতি স্পষ্টভাষী এই মানুষটির মনুষ্যসঙ্গপ্রীতি। শুষ্ক, শূন্য সামাজিকতায় তাঁর ছিল বিতৃষ্ণা। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির, ভিন্নরুচির এত মানুষের সঙ্গে মিশতে, আলাপে গল্পেগুজবে আনন্দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে তাঁর মতো আর কাউকে আমরা দেখি নি। শান্তিনিকেতনে একজন কিছুদিন থেকে বাস করছেন অথচ তিনি তাঁকে চেনেন না বা তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন নি এমন ঘটনায় তনয়েন্দ্রনাথ

অস্বস্তি বোধ করতেন। ছেলেমেয়েদের চড়ুইভাতি কিম্বা অনুরূপ ছোটখাট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ছিল। বাঁধা রুটিনের বাইরে অনেকের সঙ্গে একত্রে মিলনই ছিল সেই আনন্দের মুখ্য উপাদান।

ভারতবর্ষের পুরাগত জীবনাদর্শের প্রতি তনয়েন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অর্থের প্রতি, উপকরণের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণই ছিল না। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর তিনি যে বেতন পেতেন অন্য যে-কোনো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে অথবা কলেজের অধ্যাপকরূপে তার চেয়ে অধিক অর্থ তিনি অনায়াসে উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু সে কথা একদিনের জন্যও তাঁর মনে উদয় হয় নি। সে সামান্য বেতনে, দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সেই স্বল্পতার মধ্যেই পূর্ণ আনন্দে তাঁর দিন কেটেছে। তারপর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অবস্থার পরিবর্তনে তাঁর আর্থিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন যখন হয়েছে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা দেখা দিয়েছে, তখনো তিনি সমান নিরাসক্ত। ভবিষ্যতের জন্য, দুর্দিনের জন্য দুশ্চিন্তা বা সঞ্চয়প্রয়াস তাঁর ছিল না বলা চলে।

দেশের এক ক্ষুদ্র প্রান্তে, সমাজের দৃষ্টিতে যে কাজের মর্যাদা সামান্যই এমন কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তনয়েন্দ্রনাথ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি দেশবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে তাঁর নাম অতি অল্প লোকেই শুনেছেন। কিন্তু আমাদের এই অনতিবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি এই ক্ষুদ্র 'স্কুলমাস্টার'দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা, শিক্ষাদান ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিকাশমান জীবনের প্রতি অনুরাগ, ধৈর্য, অভিনিবেশ— এগুলি সঞ্জীবিত রাখতে সহায়তা করেছেন। দেখিয়েছেন মানুষের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রণালী নয়, উপকরণ নয়, মানুষই প্রধান উপায় ও অবলম্বন। দেশসেবা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত উক্তির প্রতিধ্বনি করে তাই বলতে

হয় যে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আত্মপ্রচারের তুমুল ঢক্কানিনাদের আলোড়নের বাইরে, জীবন দিয়ে যে ক্ষুদ্র দীপশিখাটি তিনি জ্বেলেছিলেন তার আলো বহুদূর আলোকিত করে নি সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে দেশের প্রান্তে প্রান্তে এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ দু-চারটি করে জ্বলে উঠে একদিন দীপালি উৎসবও হতে পারবে, ক্রমে রাত্রি প্রভাত হবে, দেশের শুভদিন আসবে।

[বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা থেকে গৃহীত]

আঠারো : সুবোধনারায়ণ চৌধুরী

শারীরচর্চার শিক্ষক পদপ্রার্থী হয়ে আমি সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে আসি ১৯৪৮ অব্দে। কোন মাসে কোন দিনে যে আমি এসেছিলাম তা আমার আর মনে নেই। মনে পড়ে বিকেলবেলা উদয়নের প্রশস্ত বারান্দায় উপস্থিত হয়েছি, চার পাঁচ জন গণ্যমান্য লোকে আমার গুণাগুণ অভিজ্ঞতা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে শারীরশিক্ষা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। বুদ্ধিবৃত্তির যেমন উৎকর্ষসাধন দরকার ঠিক তেমনি দরকার খেলাধুলা প্রভৃতির সাহায্যে শরীরস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন। শরীর ও মনের শিক্ষা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই পরস্পর-সাপেক্ষতার বোধ জাগ্রত করা যায়, যদি শারীরশিক্ষার শিক্ষককে অবজ্ঞাত ড্রিলমাস্টারের মতো একঘরে করে না রাখা হয়, যদি তাঁর সঙ্গে হাত মেলান অন্যান্য অধ্যাপকেরা।

গণ্যমান্যদের একজনকে দেখলাম শক্ত সমর্থ চেহারা, প্রশস্ত কপালে চিন্তাশীলতার ছাপ, দৃঢ় চিবুকের মধ্যে প্রখর ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত। ইনি কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ বসেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ হলে পর আমি চলে আসছি, এমন সময় খুব আন্তরিকতার সুরে এই ভদ্রলোকটি বললেন : হাত মেলাতে তো রাজি, ঠিকমতো ডেকে নিতে পারবেন ?

মামুলি প্রশ্নের মামুলি জবাব এর আগে অনেকবার দিয়েছি। কিন্তু এ তো ছেঁদো কথায় জবাব দেবার মতো প্রশ্ন নয়, এ যে একেবারে কেজো মানুষের কাজের কথা। এ-চ্যালেঞ্জের জবাব কি দেব ? শুকনো মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম, ভাবখানা এমন যেন : দেখে নেবেন কর্মক্ষেত্রে।

মাস তিন চার পরে সত্যিই নিয়োগপত্র নিয়ে নামলাম শান্তিনিকেতনের কর্মক্ষেত্রে। প্রবল আগ্রহ ছিল সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করার।

শুনলাম তাঁর নাম তনয়দা। আপন বৈশিষ্ট্যে তিনি বিশেষ—একাধারে শ্রদ্ধা ও ভীতির পাত্র তিনি। ছেলেরা যেমন তাঁকে সমীহ করে তেমনি তাঁর কাছে তাদের আবদারের অন্ত নেই। মাস্টারের তর্জন গর্জন প্রহার তিরস্কার ছাত্রছাত্রীদের কাছে এমন লোভনীয় হতে পারে, এই অসম্ভব সত্যটা আবিষ্কার করতে ভারি ইচ্ছা হল। তারপর একদিন আলাপও হল, কিন্তু প্রগল্ভ ঔৎসুক্য প্রতিহত হল তাঁর গাম্ভীর্যের কাছে। লোককে দূরে রেখে কাছে টানার একটা আশ্চর্য কৌশল তাঁর জানা ছিল? এই আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় তনয়দাকে সামান্য যা বুঝেছি, তাই নিবেদন করছি।

আমার আপিসে বসে মাথা নিচু করে কাজ করছি। 'আসতে পারি' এই দুটো কথার মধ্যে সহজ আন্তরিকতা ছড়িয়ে ঢুকে পড়লেন তনয়দা। কখন যে সম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি নিজেই জানিনা। ভ্রূকুঞ্চিত মুখখানা দেখে প্রমাদ গণলাম, বুঝলাম আমার অতি-শিষ্টতা তাঁর ভালো লাগেনি। কোনো কথা বললেন না, বসলেন, ধূমপান করলেন। তারপর ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: কাজ তো অনেক করেছেন। ন'টা বাজল, চলুন একটু চা খাইগে।

কাছেই কো-অপ্-এর চায়ের দোকান। খুশি মনে গেলাম তনয়দার সঙ্গে। চা, মিষ্টি, সিঙাড়ার অর্ডার দিয়ে হঠাৎ ঝপ্ করে আগে ভাগে বসে পড়লেন। আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি কিন্তু আপনার মতো অত ভদ্র নই। বুঝলাম এই হল আমার আচরণের বিলম্বিত জবাব। চা মিষ্টি খাওয়া হল। দাম মিটিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এটা ওটা জিজ্ঞেস করলেন, আমিও হাঁ হুঁ-গোছের কি-যেন সব জবাব দিলাম। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের জড়তা কাটিয়ে আমি-যে নিজের তরফ থেকে কিছু বলব, কিছু শুধাব—তেমন দুঃসাহস হল না। মনের কথা মনে রয়ে গেল। এদিকে তাঁর ক্লাসের সময়

হয়ে এসেছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন : যাই মশাই, এক্ষুনি ঘণ্টা পড়বে। তাঁর চিরসঙ্গী সেই বইপত্রের ঝোলাটি কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন, নিত্যসহচর সেই খাটো সাইকেলটি তুলে দিলেন। প্যাডেল-এ পা দিতে চকচকে কালো তাঁর বিদ্যাসাগরী-কাবুলি চটি ঝকঝক করে উঠল। ক্লাসের তাগিদ আছে, কিন্তু ব্যস্ততার অস্বস্তি নেই—ধীর, শান্ত, নিশ্চিত গতিতে যথাসময়ে গাছতলায় ক্লাসে হাজির হবেন তনয়দা।

তনয়দা আচমকা আমার ঘরে এলেন। অন্তরঙ্গের মতো আমায় ডেকে নিলেন। চা মিষ্টি খাওয়ালেন, দুচার কথা জিজ্ঞেসও করলেন—এর তাৎপর্যটুকু নিয়ে তখনো আমি মাথা ঘামাচ্ছি।

যত দিন যেতে লাগল ততই যেন বুঝতে পারলাম প্রথম পরিচয়ে তাঁর সেই সহজ আত্মীয়তার অর্থ। সেই যে বলেছিলেন : হাত মেলাতে রাজি—যদি ডেকে নিতে পারেন। আমার অপরিচয়ের জড়তা ভাঙবার জন্য তিনি আপনা থেকেই এসেছিলেন হাত মেলাবার জন্য। কেবল আমার বেলা নয়, অন্য অনেকের বেলা দেখেছি তনয়দার এই সস্নেহ সমদৃষ্টি। তাঁর ভাবখানা ছিল এই : আমরা সবাই সহকর্মী, ক্ষেত্র পৃথক হতে পারে, কাজের পদ্ধতি পৃথক হতে পারে—কিন্তু উদ্দেশ্য এক। পড়াশোনা, খেলাধুলা, সভাসমিতি, নাচগান, পিকনিক—অর্থাৎ আশ্রমজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি ছিল তাঁর চোখে গুরুদেবের পরিকল্পিত 'সমগ্র' শিক্ষার অঙ্গ। আপন সাধনার ফলে উপযুক্ত কর্মী খেলার মাঠকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করতে পারেন এবং শিক্ষকের তুলনীয় মর্যাদা অর্জন করতে পারেন—এ বোধ আমার মনে তনয়দা সুস্পষ্ট-ভাবে মুদ্রিত করে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে খেলার মাঠের গুরুগিরিতে যদি আমায় সত্যি সত্যি কেউ বহাল করে গিয়ে থাকেন, তিনি হলেন তনয়দা। এক কালে তিনি ভালো খেলতেন—তাঁর সম্বন্ধে একথা যেমন সত্যি, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্যি হল

এই যে, খেলা তিনি ভালোবাসতেন। ম্যাচ্ হোক প্র্যাক্‌টিস হোক্—প্রায় সব খেলাতেই তিনি হাজির। খেলার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর মতামত জানবার জন্য ছেলেদের অসীম আগ্রহ। খেলার কলাকৌশল, কায়দাকানুন, ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে তিনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। আমাকেও টেনে নিতেন এ-সব আলাপ আলোচনায়। এইভাবে তাঁর আওতায় আমার শিক্ষানবিসী শুরু হয়। শান্তিনিকেতন ছোট জায়গা হলে কি হবে—শারীরচর্চা-শিক্ষকের সমস্যা এখানে জটিল। প্রতিদিন নানান বয়সের তিন চার শো ছেলেমেয়ে নানারকম খেলা খেলছে, নানা প্রতিযোগিতা, বারো মাসে তেরো পার্বন। ছোট জায়গার মস্ত একটা সমস্যা হল জনমত। প্রতিযোগিতার দল-গঠন, খেলোয়াড় নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে অনেক সময় বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এই রকম সংকটে তনয়দা ছিলেন আমার প্রধান সহায়। যেমন কঠিন ছিল তাঁর সমালোচনা, তেমনি অকুণ্ঠ ছিল তাঁর সহযোগ। একটা ঘটনার কথা বলি—

বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় একজন অবাঙালী খেলোয়াড় নেমেছে বিশ্বভারতীর দলে। ছেলেটি খেলে ভালো, কিন্তু তার অঙ্গভঙ্গীতে কেমন যেন সব সময় একটা যুদ্ধং দেহি ভাব। এ নিয়ে সমালোচকেরা অনেক বিরূপ মন্তব্য করলেন—তনয়দাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁকে একদিন একান্তে পেয়ে বলেছিলাম এই ছেলেটির কথা। কেবল খেলার মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও ওর আচরণ এমন যেন আর সবাই ওর প্রতিপক্ষ। এই রকম অস্বাভাবিক ব্যবহারের মূলে ছিল যে-মনস্তাত্ত্বিক কারণ, সে-সব কথাও তনয়দাকে বললাম। পরিশেষে বললাম খেলার ভিতর দিয়ে তাকে শুধরে নেবার সুযোগ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাকে খেলতে দেওয়া সঙ্গত। কথাটা তনয়দার মনের মতো হল বললে যথেষ্ট বলা হবেনা। সেই ছেলেটি বছর তিন পরে যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেল তখন সে অন্য মানুষ। তার সেই লড়িয়ে ভাব আর নেই। বিদায় নিতে এসে বলে গেল শান্তিনিকেতন

তার ভালো লেগেছে এবং সবচেয়ে ভালো লেগেছে তনয়দার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার।

'মাঠের শিক্ষায় কত ছেলেমেয়ে যে তরে যাচ্ছে, এ যদি কর্তৃপক্ষ বুঝতেন তাহলে আপনার কাজে অনেকটা সুবিধা হত।' তনয়দার অবর্তমানে তাঁর এই মন্তব্য আমার প্রায় মনে পড়ে।

তনয়দার চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের যে প্রধান তিনটি গুণ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, তা হল তাঁর হৃদয়বত্তা, সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শনিষ্ঠা। তাঁর প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের সামান্য একটু পরিচয় ইতিপূর্বে দিতে চেষ্টা করেছি। সত্যের খাতিরে তিনি কঠিন কথা বলতে কোনোদিন ইতস্তত করেননি। এই চাকুরীজীবীর রাজ্যে এ-রকম অকুতোভয় একটি মানুষ দুর্লভ। সবার উপরে ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। অনলস অধ্যবসায়ে তিনি এই আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন। ফাঁকি কোনোদিন দেননি—নিজেকে ক্ষমাহীনভাবে খাটিয়েছেন। গুরুতর রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলেও ছুটি নিতে চাননি। তারপর যখন ছুটি নিলেন তখন তা হল শেষবারের মতো, চির-দিনের মতো।

উনিশ : কাশীনাথ ভট্টাচার্য

সাল-তারিখ বিশেষ মনে নেই, তবে সময়টা পুজোর ছুটির পর। আমি তখন থাকি সতীশ-কুটীরে—ছাত্র-পরিচালকের পদে, আর তনয়দা পাঠভবনের রেক্টর। রান্নাঘরে ছেলেদের ব্যবহার নিয়ে কি-একটা গণ্ডগোল হয়। ফলে রবিদা খুব রাগারাগি করেন,—আমিও রাগারাগি বিশেষ কম করেছিলাম বলে মনে হয় না। এর পরের দিন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় রাজকৃষ্ণ (রান্নাঘরের কর্মী) পিওন বুক বার করে একটা চিঠি নেবার জন্য সই করতে বলায়, আমার মেজাজ যায় বিগড়ে। আমি বলে উঠি : পিওন বুক ? আপিসে নিয়ে যেও।

তার পরের দিন ছিল মঙ্গলবার। যথারীতি স্কুলে গেছি। ন-টার সময় আপিসের ভিতরে বাইরে চায়ের মজলিস বেশ জমে উঠেছে। তনয়দা আছেন, আর তনয়দা থাকলেই ছেলেমেয়ের দল এসে জোটে— তারাও আছে। আমি ও তনয়দা চায়ের কাপ হাতে করে গল্প করতে করতে আপিসে এসে ঢুকলাম। তনয়দা নিজের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমি টেবিলের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে—দুজনেরই হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। হঠাৎ তনয়দা বলে উঠলেন : আচ্ছা আমি রেক্টর হয়েছি কি বুড়োদের ঝগড়া মেটাবার জন্য ? আমি বললাম : কোথায়, কে আবার ঝগড়া করল। তিনি একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের সীট দেখিয়ে বললেন : এই যে আপনার সঙ্গে রবির ঝগড়া, আপনি নাকি তাকে আপিস দেখিয়েছেন।

আমি বললাম : শুনুন—

শোনবার আর কি আছে, রবি কি মিথ্যে কথা লিখেছে—বলেই খুব রেগে উঠলেন।

আমিও রেগে গিয়ে বললাম : বেশ তো, আপনি যখন শুনবেনই না, বলে

দিন যে, আমি এখানকার উপযুক্ত লোক নই। আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

বাস্, আর যায় কোথায়! তনয়দা যেন ফেটে পড়লেন: একথা বলবার মানে?

মানে আর কিছুই নয়, আপনি ভাবেন অন্য লোকের মন বলে কোনও পদার্থ নেই। আপনার কথায় আমার মনে বেশ আঘাত লেগেছে। আমি আর এখানে থাকব না।

এর পর তনয়দা চায়ের কাপ টেবিলের উপর রেখে, আমার সামনে এগিয়ে এসে, হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে হাত-জোড় করে বললেন: মাপ করুন মশাই, আর আমি আপনার সঙ্গে কখনও কোনো কথা বলব না।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। তখনও আমার এক হাতে প্লেট আর হাতে চায়ের কাপ। আমি তো বটেই, ঘরের অন্য সব লোকও হতভম্ব।

এর কিছু পরেই আমি আমার ঘরে চলে গেলাম—ক্লাস ছিল, গেলাম না। স্নান সেরে শ্রীরামপুরের বাড়ীতে চলে যাব—এই তখন মনের ভাব। কিন্তু বাড়ি যাবার রেল ভাড়া? সব মিলিয়ে একটাকা চোদ্দ আনা হল না—বোধ করি এক টাকার নিচেই আমার তখন পুঁজি—অতএব বাড়ি যাওয়া আপাতত স্থগিত।

ঘর বন্ধ করে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করলাম পুব দিকে। তখন পূর্বপল্লীর দিকে মাত্র তিন-চারখানা বাড়ি ছিল। রেল-লাইন পেরিয়ে চলে গেলাম পারুলডাঙা। একটা গাছতলায় বসলাম। এগারোটার ঘণ্টা অর্থাৎ ক্লাস-শেষের ঘণ্টা শুনতে পাওয়া গেল। বেশ খিদে পেয়েছে।

মনে মনে যুক্তি-তর্ক করছি: তনয়দা তো এরকম প্রায়ই করে থাকেন,

সত্যি তো আর কারো উপর কোনো দিন রাগ করেন না। এর আগেও তো কতবার রাগারাগি হয়েছে। এইতো সেদিন সেবকদার সঙ্গে ব্যাড্মিণ্টন খেলতে গিয়ে, রেগেমেগে র‍্যাকেট ভেঙে ফেলে দিয়ে, মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আবার সেই দিনই রাত্রে রান্নাঘরে খাবার পর সেবকদার বাড়ি গিয়ে পান-জরদা খেয়ে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত গল্পগুজব করলেন।

এই সব ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি ঘড়িতে দুটো বাজছে। শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা দিলাম।

গেট দিয়ে শান্তিনি:কতনে ঢোকবার মুখেই (তখন তিনটে) হঠাৎ দেখি পরিচিত বেঁটে সাইকেল, বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে ঝোলানো ব্যাগ— আরে, তনয়দা যে! ঘুরে দ্বারিক-এর পথ ধরলাম। খানিক বাদে দেখি তনয়দা পেছন থেকে ডাকছেন। আমি দাঁড়ালাম, উনিও সাইকেল থেকে নাবলেন।

বেশ চড়া মেজাজে জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় খেলেন? কার উপর রাগ করে খেলেন না শুনি? আমি বললাম : খাইনি কে বললে?

কোথায় খেলেন? রান্নাঘরে তো দেখিনি।

কোথায় খেলাম তাও বলতে হবে নাকি?

হ্যাঁ।

দু-একটা পরিচিত বাড়ির নাম করলাম আমতা-আমতা করে। হো হো করে হেসে উঠলেন : ও-সব জায়গায় আপনি আজ যানই নি, তবে খেলেন কি করে? যাক, খেতে তা হলে আপত্তি নেই তো? আসুন।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা টোষ্ট চীজ ও ডিম খেতে দিলেন। তার পর খুব ধীর গলায় (একটু বোধ হয় ধরা গলাও ছিল) বললেন : আচ্ছা, এরকম

ছেলেমানুষি করেন কেন বলুন তো ? চলুন, আজ আবার teachers' meeting আছে চারটায়।

এক সঙ্গে গেলাম মীটিঙ-এ। সকলেই বেশ মুচকে মুচকে হাসছে। আমি ভাবলাম বোধহয় আমাকে দেখেই হাসছে সবাই।

তনয়দা আমাকে তাঁর পাশেই বসালেন। সেদিন মীটিঙ-এ Domestic Science-এর মেয়েদের হাতের রান্না খাওয়ান হল। তনয়দা আমাকে দেখিয়ে বললেন : এঁকে দু-প্লেট দাও, কারণ আছে।

আমি যত বলছি না না, উনি ততই হো হো করে হেসে বলেন : আরে দাও দাও, ও বেশ খেতে পারে !

এর পরের সাত দিন তনয়দার কাছে আমার আদরের অন্ত ছিল না। পরে রবিদার কাছে শুনেছিলাম যে, এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত তনয়দা ও রবিদা ঐ দিন শান্তিনিকেতনের সব জায়গা খোঁজা শেষ করে, স্টেশন-এ গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন যে আমি সেখানে কোথাও আছি কিনা। স্টেশন থেকে ফেরবার পথে আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন গেট-এ তাঁর দেখা।

আমার কিন্তু রাগ তখনো পড়েনি। আমি ভেতরে ভেতরে কলকাতার হিন্দি হাইস্কুলে একটা চাকরির জোগাড় করে ফেলেছিলাম। কথাটা দু-এক জনকে বলেওছিলাম।

একদিন হঠাৎ দুপুরের খাওয়ার পর তনয়দা বললেন : চলুন আপনার ঘরে গিয়ে একটু কফি খাই। ঘরে এসে বসলেন। কফি খাওয়া হচ্ছে, ঘরে আমি আর তনয়দা। হঠাৎ বলে উঠলেন : আপনি নাকি চাকরি করতে যাচ্ছেন বাইরে। কই, দেখি আপনার appointment letter। চিঠিটা দেখালাম। খুব গম্ভীর হয়ে বললেন : গ্রামের স্কুলে যদি মাস্টারি করতে যেতেন, তবে বলতাম যান। কলকাতার স্কুলে আপনি যেতে পাবেন না।

আমি অতি অনায়াসেই বলতে পারলাম : বেশ, যাব না তা হলে।

সেই দিনটার কথা আমার আজো বেশ মনে আছে। বাইরে রুক্ষ দুর্মুখ লোকটির মন কত-যে নরম ছিল, তা মনে পড়লে আজো চোখে জল আসে। তনয়দার অফুরন্ত স্নেহের কিছু ভাগ আমি পেয়েছি সে জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

কুড়ি : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এই খবর প্রথম যখন শুনলাম মনের ভেতরটা সেই মুহূর্তেই হুহু করে উঠেছিল। কয়েকদিন ভালোয় ভালোয় কেটে যাওয়াতে চিকিৎসকরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, এ যাত্রায় বোধকরি তিনি সামলে উঠলেন। তথাপি মনে সত্যি তেমন আশ্বস্ত বোধ করিনি। কেবলই মনে হয়েছে এবার তিনি বাঁধন কাটাবেন। আজকাল মনটা এমনি হয়েছে, কোন অশুভ সম্ভাবনা দেখলেই অতি মাত্রায় অস্থির হয়ে ওঠে। মন যেন সারাক্ষণ সশঙ্কিত হয়ে আছে; সেটা নিতান্ত অকারণে নয়। গিয়ে থুয়ে আর আমাদের বেশি বাকি নেই—'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়'—পুঁজিপাটা তো আর বেশি নেই, একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে; তারই মধ্যে একজন যখন বিদায় নেন তখন অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল অক্লান্তভাবে শান্তিনিকেতনের সেবা করে তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ আজ চিরবিশ্রাম নিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের জীবনে কি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝবেন শুধু তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মিগণ আর বুঝবে এখানকার ছাত্রছাত্রীর দল যাদের মধ্যে তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসুর যুগ থেকে শুরু করে গত একশত বৎসরে বাংলাদেশে বহু আদর্শ শিক্ষকের জন্ম হয়েছে এবং এঁদের সাধনার ফলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশের সে গৌরবের যুগ শেষ হয়ে এসেছে। তার কারণ, যে-শিক্ষক-সম্প্রদায় এই জাতিকে গড়ে তুলেছিলেন সেই-জাতীয় শিক্ষক দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছে। তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ সেই শিক্ষক-সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিনিধি। তিনি জাত-শিক্ষকদের একজন, যাঁর সম্বন্ধে বলা যায়—লাখে না মিলল এক। এই কারণে তাঁর মৃত্যু শুধু শান্তিনিকেতনের পক্ষেই নয়,

আমার মতে সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষে একটি তুর্ঘটনা। খবরের কাগজে টুকরো খবর দেখেছি : শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ পরলোক গমন করেছেন। বড় বড় খবরের চাপে এ খবর কোথায় তলিয়ে গেছে, ক'জনের বা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'ঐ যে তারিণী তলাপাত্র শূন্যের দিকে ঘুঁষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেই তুর্দান্ত খবরটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর।' তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুসংবাদটা সংবাদই নয়।

একথা সত্য যে শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁর পরিচয় বহুবিস্তৃত ছিল না। বলতে গেলে তাঁর নাম কাম শান্তিনিকেতনের বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই ছাত্রসম্প্রদায়ের কাছে তিনি যে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা পেয়েছেন তা স্বচক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এমন সর্বান্তঃকরণে শিক্ষক, এমন কায়মনোবাক্যে শিক্ষক জীবনে কমই দেখেছি। দেবধর্মের কথা কোনোকালে তাঁর মুখে শুনিনি, শিক্ষাদানকেই ধর্মকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাদান এক কথা, শিক্ষাদান অন্য। বিদ্যার চাইতে অনেক বড় জিনিষ শিক্ষা।

বিদ্যা যে আহরণের বস্তু আর শিক্ষা যে আচরণের এই সহজ তত্ত্বটি তনয়বাবুর জানা ছিল, এই জন্যেই শিক্ষক হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ। আজীবন শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু কেবলমাত্র পরীক্ষা-পাশের জন্য ছাত্র তৈরি করেননি। যে বিদ্যা "মেধয়া" কিম্বা "বহুনা শ্রুতেন" লভ্য সেই বিদ্যার কারবার তিনি করেননি। যে জীবন্ত বিদ্যা প্রাত্যহিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে—মনসা কর্মণা বাচা—সেই বিদ্যারই চর্চা করেছেন তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। এক কথায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মূল কথাটি তিনি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। এমন সদাজাগ্রত, সজীব মন সচরাচর দেখা যায় না। চৌষট্টি বৎসর বয়সেও উৎসাহে, উদ্দীপনায়, জীবনচাঞ্চল্যে চব্বিশ বৎসরের যুবককে হার

মানাতে পারতেন। শিখবার জানবার কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা! বিশেষ করে শিক্ষা সম্পর্কে কোথায় কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার আধুনিকতম খবর তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মাইনের মোটা অংশ বই কেনাতেই ব্যয় হত।

শান্তিনিকেতনের সব চাইতে বড় আকর্ষণ, এখানে দুটি-চারটি অতিমাত্রায় ছিটগ্রস্ত মানুষ সব সময়েই দেখা গিয়েছে। তাঁরাই এস্থানকে বিশেষ একটি চরিত্র দিয়েছেন। ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি বলতে বুঝি—বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। এঁরা বাঁধা রাস্তায় চলেন না, বাঁধা গৎ আওড়ান না, এঁরা আর পাঁচজনের মতো নন, একেবারে পঞ্চম। লোকে এঁদের ভালো করে বুঝতে পারে না বলেই বলে এঁদের মাথায় ছিট আছে। আমি তো অনেক সময় বলে থাকি, যার মাথায় ছিট নেই তার মাথায় কিছুই নেই। তনয়বাবুর সর্বোত্তম গুণ তিনি ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য এমন মানুষের সঙ্গে প্রতি পদে মতান্তর ঘটবার আশঙ্কা থাকে। তনয়বাবুর সঙ্গে তর্ক না হয়েছে, ঝগড়া না হয়েছে, এমন মানুষ শান্তিনিকেতনে কমই আছেন। হয়তো বা ক্ষণকালীন মনোমালিন্যও ঘটেছে কিন্তু কোথাও এতটুকু মলিনতা স্পর্শ করেনি।

তনয়বাবুর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁর ঝগড়া বিবাদের মধ্যেও প্রকাশ পেত। তর্ক করতেন, ঝগড়া করতেন, পরক্ষণেই আবার ভুলে যেতেন। এ যেন শরৎকালের মেঘ—এই বিষ্টি এই রোদ। সকাল বেলায় যাকে কটুভাষণে জর্জরিত করেছেন বিকাল বেলায় মিষ্টান্নের পাত্র হাতে তারই দোরে হাজির, কেননা কটুকথা বলে সারাদিন নিজের মনেই অশান্তি ভোগ করেছেন। সকাল বেলায় যে মেঘটুকু জমেছিল বিকেল বেলায় নির্মল হাস্যে তা উড়িয়ে দিয়েছেন। যে ছেলেকে এই একটু আগে প্রচণ্ড গালি দিয়েছেন অনতিকাল পরে তাকেই বসিয়ে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। জগদানন্দবাবুর মার খাওয়ার মতো তনয়বাবুর গাল খাওয়াটা ছেলেদের পক্ষে লোভনীয় বস্তু ছিল। বাইরেটা এমন রুক্ষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে এমন স্নেহার্দ্র হৃদয় খুব কমই দেখেছি। আমি নিজে

শিক্ষক এবং শিক্ষকের সন্তান্। শিক্ষকের মর্ম আমি অল্পবিস্তর বুঝি। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আমার পিতার খ্যাতি এককালে বহুবিস্তৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে তিনি একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সাধ্যমতো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। দেশের দূর প্রান্তে আমার পিতার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবির প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার পিতার মধ্যে আমি শিক্ষক চরিত্রের যে মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি প্রথম পরিচয়ে ঠিক সেই চরিত্র-মহিমা তনয়বাবুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। তনয়বাবুর সঙ্গে অনেক আড্ডা দিয়েছি, গল্প করেছি, কিন্তু একদিক থেকে তিনি যে আমার গুরুস্থানীয় সেই কথাটি কোনোদিন তাঁকে বলা হয়নি। আগেই বলেছি তনয়বাবু ছিটগ্রস্ত মানুষ ছিলেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই বলেই এমন নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুটো প্রশংসার কথা উচ্চারণ করতে পারলাম। সশরীরে বর্তমান থাকলে বাকী জীবন আর আমার মুখদর্শন করতেন না ; কারণ নিজের প্রশংসা শুনতে তিনি ভালোবাসতেন না। কেউ পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে তেড়ে মারতে আসতেন। আজ তাঁর অগণিত ছাত্র ছাত্রী তাঁর অগোচরে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করবেন। আমিও এই সুযোগে আমার প্রণামটি নিবেদন করে দিলাম।

সেদিন তনয়বাবুর শেষকৃত্যের সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। শ্মশানে এলেই মানুষের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিনা জানি না। আমি স্বভাবত সংসারবিরাগী মানুষ নই। তথাপি দুঃসহ রৌদ্রতাপে দিগন্তবিস্তৃত খোয়াই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন জানি না রবীন্দ্রনাথের 'খোয়াই' কবিতাটি আমার মনে পড়ে গেল। সেই যেখানে বলেছেন : এইখানে বসেছি একটা কাজকে রূপ দিতে। সেই কতকাল আগে যাঁরা তাঁর কাজে হাত মিলিয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছিলেন, 'যারা মন মিলিয়েছিল এখানকার বাদলদিনে আর আমার বাদলগানে তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে। আমারও যখন শেষ হবে দিনের

কাজ, নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে আকাশের ওপার থেকে তারপরে ?’ সেই তারপরের যে জবাবটি কবি দিয়েছেন সে বড় মর্মান্তিক—

তারপরে রইবে উত্তরদিকে
ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা
দক্ষিণদিকে চাষের খেত,
পুবদিকের মাঠে চরবে গোরু,
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা ॥

শুধু এই থাকবে ? কই, মাঝখানে ঐ যেখানটাতে একটা কাজকে রূপ দিতে বসেছিলেন তার কথা তো কিছুই বললেন না, সে কি থাকবে না, সে কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ?

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী কবি। সারাজীবন আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। বোধকরি কোনো হতাশ মুহূর্তে তাঁর মনে নৈরাশ্যের স্বর বেজেছিল, তাই এমন মর্মান্তিক কথা উচ্চারণ করেছিলেন। মুহূর্তের দুর্বলতায় আমার দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। কারণ এ হতেই পারে না। কবির সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। আর ঐ যাঁরা তনয়বাবুর মতো হাত মিলিয়েছিলেন মন মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, তাঁদের নিষ্ঠাও বৃথা যাবে না।

এঁদের দেহ-ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখীর ন্যায় নবতর রূপ নিয়ে শান্তিনিকেতনের জন্ম হবে, বহুবিধ সাময়িক বিঘ্ন অতিক্রম করে শান্তিনিকেতনের প্রতিভা একদিন উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে প্রকাশিত হবে।

[সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা ২৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা থেকে গৃহীত]

তনয়বাবুর অসুখের সংবাদ পেলাম ইউরোপে বসে। আমার স্ত্রী জানালেন তাঁর করোনারি থ্রম্বোসিস হয়েছে, ডাক্তার তাঁকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। যে-লোক সহজে ছুটি বা বিশ্রাম নিতে চান না, যিনি নিজেকে সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন, ছুটির মধ্যেও যিনি ছাত্রদের ডেকে পড়ান, সে-লোকটি কিভাবে ডাক্তারের এই নির্দেশ পালন করবেন তাই ভেবে কৌতুক অনুভব করলাম। তনয়বাবু তো বিশ্রাম নেবার পাত্র নন, তবে রোগটাও যে কঠিন।

যেদিন গভীর রাত্রে বিদেশ থেকে বিনয়ভবনে ফিরলাম তার পরদিনই তনয়বাবুকে দেখতে গেলাম। তাঁর বৈবাহিক আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর বাড়িতে তিনি ছিলেন। অসুখ হওয়াতে তাঁর কন্যা তাঁকে নিজের কাছে এনে রেখেছিল। তনয়বাবু তখন একটা তক্তাপোশের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। ঘরের মধ্যে কয়েকটা মোড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। শিয়রের কাছে একটিতে তাঁর মেয়ে বসে ছিল। আমরা পাশে গিয়ে বসলাম।

সেদিন সারা বৈকালটা তনয়বাবুর সঙ্গে গল্প করে কাটল। মাঝে দু-একবার তাঁর বিশ্রামের কথা তুলে উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি আপত্তি করাতে আর শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ওঠা হল না। সেখানে বসে বসে অনেক কথা, অনেক গল্প হল। পুরানো দিনের কথা, তাঁর প্রথম আশ্রমে আসার কথা, আশ্রমে আসার পর অল্প দু-একবার যে তাঁর অসুখ হয়েছিল তার কথা ইত্যাদি। কথার ফাঁকে একবার তিনি বললেন : দেখে নেবেন, আর দু-এক বৎসরের মধ্যে শেষ করে ফেলব। বললাম : মৃত্যুর কথা বলতে নেই। একবার তিনি বললেন : দেখবেন আমি কারও সেবা নেব না। পাশে নিবেদিতা বসে ছিল, আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম : ওর সামনে এরকম কথা বলে কেন ওর মনে

কষ্ট দিচ্ছেন? আর সেবা না নেবার কথা, ও বিষয়ে কোনো অভিমান না রাখাই ভালো।

সন্ধ্যার সময় আরও দু-একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখন আমরা বিদায় নিয়ে উঠে এলাম। সেইদিনই গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে তিনি মারা গেলেন; ঠিক কখন গেলেন সে-কথা কেউ জানতেও পারল না। খবর পেয়ে পরদিন প্রাতে যখন গেলাম তখন তাঁকে দেখে মনে হল যেন ঘুমিয়ে আছেন।

তনয়বাবু যেদিন প্রথম আসেন সেদিনকার স্মৃতির সঙ্গে দৈবক্রমে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। সে আজ প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, সে স্মৃতি আমার মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার কিছুদিন আগেই আমি গ্রামের কাজ ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে আশ্রমের কাজে ভর্তি হয়েছি ও শমীন্দ্রকুটীরে ছেলেদের মধ্যে আছি। শমীন্দ্রকুটীরের পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ যে-পথ চলে গেছে; সেই পথ দিয়ে বোলপুর থেকে লোকে আশ্রমে আসত। সেদিনটা বোধ হয় ছুটির দিন ছিল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে শিবেনের সন্ধান করলেন। শিবেন (শ্রীশিবেন্দ্রনাথ রায়) আশ্রমের অধ্যাপক অধুনা-স্বর্গত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন এখানে ছাত্র। কে ঐ সৌম্যদর্শন, ঋজুকায়, স্বাস্থ্যবান, সবলদেহ ভদ্রলোক শিবেনের সন্ধান করছেন তাই ভেবে কৌতূহল হল।

খানিক পরেই পরিচয় পেলাম ইনিই আমাদের নতুন সহকর্মী তনয়বাবু। এখন মনে হচ্ছে আশ্রমে আমার সঙ্গেই তাহলে তনয়বাবুর প্রথম দেখা। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল, দু-একটা কথাও হল। স্বল্পভাষী লোকটি, কিন্তু তাঁর কথাগুলিতে বেশ একটা জোর আছে। আমাদের সহকর্মী সত্যজীবনবাবুর সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল, তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন। তনয়বাবুর

থাকবার জায়গা হল শমীন্দ্রকুটীরের পাশে 'কেবিনের' দোতলায়। অধ্যাপকদের মধ্যে আমিই হলাম তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী।

শমীন্দ্রকুটীরের পিছন দিকে বারান্দার এক কোণে ছেলেদের কাজের জন্য কোদাল ও অন্য হাতিয়ার রাখবার একটা ছোট্ট ঘর ছিল। সেটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আমি সেখানে চা তৈয়ারি করবার জন্য একটা রান্নাঘর বানিয়ে নিয়েছিলাম। আমার চায়ের ভাগীদার ছিলেন নরেনদা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী। তনয়বাবু চা খেতেন, আমাদের চায়ের ক্লাবে যোগ দিলেন। বুধবার ও ছুটির দিনে আমাদের ক্লাবের বৈঠকটা একটু ফলাও করে হত। আমাদের জল গরম করবার ও চা করবার পাত্রটা ছিল ছোট, স্থতরাং কয়েকবারই চা বসাতে হত। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে চা চলত।

কিছুদিনের মধ্যেই তনয়বাবুর একটি বিশেষত্ব চোখে পড়ল। লোকটি বাইরে রুক্ষ ধরনের, কিন্তু সেটা তাঁর আবরণ মাত্র, বোধ করি বর্মস্বরূপ। সেই আবরণ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে তাঁর স্নেহশীল অন্তরের পরিচয় পেয়ে ধন্য হতে হয়। তিনি ছিলেন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো; নিজের সম্বন্ধে বেশি কথা বলতেন না। তবে তাঁর মাতৃহারা কন্যাকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে কথা হত (তাকে তিনি ইতিমধ্যে তার মাতামহের কাছ থেকে এনে আপনার কাছে রেখেছিলেন)। সেই কথার ফাঁকে ফাঁকে চকিতে তাঁর চরিত্রের গভীর দিকটা চোখে পড়ত।

তনয়বাবু ট্রেনিং কলেজে পড়া শেষ করেছিলেন কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেন নি। এই পরীক্ষা না দেওয়া ও তকমা না নেওয়াও তনয়বাবুর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের এক প্রকাশ। তথাকথিত ট্রেন্‌ড্ শিক্ষকদের ধরাবাঁধা বুকনিতে তাঁর আদৌ বিশ্বাস ছিল না। বরং তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেও নানারকম পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি আজীবন পড়াশোনা করে গেছেন, বই পড়া ও বই কেনা তাঁর একটা বাতিকেরই মতো ছিল। তাঁর ঘরে

যে গেছে সে-ই তার পরিচয় পেয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে অনেকেরই মাস্টারি করার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চা প্রায় শেষ হয়ে যায়। অথচ আমাদেরই দেশে বলা হয়েছিল 'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্' অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই দুইই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, বিশেষ করে যিনি শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে। তনয়বাবুর জীবনে সেই আদর্শের প্রকাশ পূর্ণভাবে দেখা গিয়েছিল।

অনেককাল পরে আবার আশ্রমে ফিরে এলাম বিনয়ভবনের ভার নিয়ে। এখানে এসে এখানকার ট্রেনিং-এর ও শিক্ষার ধারায় কিছু হেরফের করব এই ছিল আমার আশা। একথা বললে আজ আর অন্যায় হবে না যে বিনয়ভবন প্রতিষ্ঠার অনেক আগে বিশ্বভারতীতে এইরকম একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করা নিয়ে এককালে গুরুদেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু তখন আর এবিষয়ে কিছু করা সম্ভব হয় নি। বিনয়ভবনে আসবার পর এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তনয়বাবুর সঙ্গে আমার কথা হত। একদিন তাঁকে বললাম ভালো কোনো একজন শিক্ষকের কাছে শিক্ষানবিসী করাই ট্রেনিং-এর সব চেয়ে বড় অঙ্গ বলে আমার এখন মনে হয়েছে, এবং বিনয়ভবনে এই ধরনের শিক্ষানবিসী ট্রেনিং-এর আবশ্যিক অঙ্গরূপে প্রবর্তন করতে চাই। আমার কথা শুনে তনয়বাবু ভারি খুশী হলেন ও বললেন যে গুরুদেবও এই মত পোষণ করতেন এবং তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অনেক জায়গায় এই কথা লিখে গেছেন।

বিনয়ভবনে আসবার আগে আমি দিল্লীতে সেণ্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউট অব এডুকেশনে কাজ করতাম। সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ-রূপে আমি গুরুদেবের An Eastern University নামক প্রবন্ধ থেকে একটি অংশ তুলে সেটাকে বড় করে ভালো করে লিখিয়ে ইন্‌স্টিটিউটের প্রবেশপথে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। দেশবিদেশের বহু শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট দেখতে এসে এই লেখার প্রতিলিপি আমার কাছ

থেকে চেয়ে নিয়ে গেছেন। এরই সূত্র ধরে আমি ইনষ্টিটিউটের সংকল্পমন্ত্র রচনা করেছিলাম : 'দীপ সে হী দীপ জলে'।

অংশটি এই রকম : A teacher can never truly teach unless he is still learning. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats his lessons to his students can only lead their minds : he cannot quicken them. Truth not only must inform but also must inspire. If the inspiration dies out and the information only accumulates, then truth loses its infinity. The greater part of our learning in the schools has been a waste because for most of our teachers, their subjects are like dead specimens of once-living things with which they have a learned acquaintance, but no communication of life and love.

তনয়বাবুকে এই কথাগুলি বলাতে তিনি খুব খুশী হলেন। তিনি যে নিজেও ছিলেন এই ধরনের শিক্ষক। তিনি নিজের জীবনে জ্ঞানের যে-দীপ জ্বালিয়ে রেখে ছিলেন তার অম্লান দীপ্তি তাঁর বহু ছাত্রের জীবনকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। দীপ হতে দীপে সেই শিখা সঞ্চারিত হোক এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

চিঠিপত্র

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক লিখিত

১। পাঠভবনের কোনো ছাত্রকে লেখা

শান্তিনিকেতন
১. ৪. ৩৫

স্নেহাস্পদেষু
খুব পরিষ্কার করে একটা কথা জানবার জন্য তোমার কাছে এই চিঠিখানা লিখছি, আশা করি কিছুই না গোপন করে মন পরিষ্কার করে শীগগিরই জবাব দেবে। তোমার একলার কাছেই আমি লিখছি, তুমিও শুধু নিজের কথা মনে করেই জবাব দেবে।

এখানকার মাস্টারমশাইরা অনেকেই, এবং ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ বলছেন যে, তোমাকে এখানে রাখলে তুমি তোমার ব্যবহার দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবে যে আশ্রমের কেউই তোমার ফিরে এসে এখানে আরো প্রায় দু বৎসর থাকাটা দুঃখের কারণ বলে মনে করতে পারবেন না। কেউই এ কথা বলতে পারবেন না : ···চলে গিয়েছিল, ভালোই হয়েছিল ; ফিরিয়ে এনে আরও দুঃখ বাড়ানো হল। তুমি জান ব্যক্তিগতভাবে খুব অল্প ছেলেকেই এখানে খারাপ বলা হয়। দলবদ্ধ হলেই ছেলেরা অনেক সময় হিতাহিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তোমার সম্বন্ধেও অনেকেরই সেই ধারণা। তুমি যদি মনে কর যে এখন এখানে এলে তুমি এমন কোনো দলে পড়বে না যাতে তুমি নিজে যা অন্যায় মনে কর তা কিছুতেই করবে না, তাহলে আমরা সাধ্যমতো তোমার পড়াশুনোতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, যাতে তুমি নিয়মিত সময়ে ভালো করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার। নিজের মনকে খুব ভালো করে বুঝে দেখে জবাব দিও। তুমি জান এখানে এখনও অনেকে আছে যারা আগে তুমি যেমন ছিলে ঠিক তেমনটি না থাকলে তোমাকে উপহাস করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। হয়তো বলবে : উঃ, কি ভালো ছেলে রে! এতদিন এটা করেছেন, ওটা করেছেন, আজকে হঠাৎ পরমহংস হয়ে গেলেন! এ রকম বিদ্রূপ সহ্য করে থেকে, নিজের মাথা ঠিক

রেখে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে চলা খুবই শক্ত কাজ, তবে অসাধ্য নয়। সেই জন্যই বলছি খুব ভালো করে নিজের শক্তির বিচার করে জবাব দিও। এটা বোধহয় তুমি স্বীকার করবে যে তোমার মধ্যে এমন কিছু দুর্বলতা ছিল যাতে তুমি কোনো কোনো ছেলের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারনি। সেইজন্যই হয়তো আস্তে আস্তে এমন পথে এগিয়েছিলে যেখান থেকে ইচ্ছা করলেও ফিরবার উপায় ছিল না। যদি মনে কর সে রকম প্রবল শক্তি এখনো এখানে থাকবে যা তোমাকে আবারও তোমার শুভ ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাবে, তবে ফিরে না আসাই ভালো। আর যদি বোঝ তেমন আশঙ্কা এখন নেই, তুমি ছেলেবেলায় যেমন ছিলে, তেমনি সহজভাবে খেলেধুলে, ফূর্তি করে, পড়াশুনো করে, আমাদের সঙ্গে আপনার লোকের মতো ব্যবহার করে অনায়াসে থাকতে পারবে, তবে তাই জানিও—গুরুদেবকে জানাব। তিনি যদি সম্মত হন শীগগিরই আবার তোমাকেও জানিয়ে দেব। কিন্তু সত্যি খুব ভালো করে ভেবে দেখো। আমরা তোমার শক্তিবৃদ্ধির সাধ্যমতো চেষ্টা করব, তোমারও কিন্তু আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে মন খুলে সব কথা জানাতে হবে। চিঠিতে এর বেশি জানানো যায় না। এটা জেনো তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে মিশে অন্যায় কাজ করা থেকে আমরা বাঁচাতে পারব না এই বুঝেই যোগ ছিন্ন করা সংগত বলে মনে হয়েছিল ; তা নইলে তোমাদের সবাই কিছু এমন অবস্থায় পড়নি যাতে মনে করা যেতে পারে যে কোনোই আশা নেই। তা যদি মনে করতাম তবে এ চিঠি লিখতাম না।

আশা করি ভালো আছ। বীরেনদার হাত দিয়ে চিঠি পাঠালাম। ইতি

তনয়দা

২। কোনো আত্মীয়কে লেখা

Santiniketan
21. 9. 1941

শ্রীচরণেষু

আপনার চিঠি পাইয়াছিলাম ৩০শে মে। জবাব দিতেছি আজ ২১শে জুন। যে অপরাধ হইয়াছে তাহার ক্ষমা হয় না, সুতরাং ও বিষয়ে বেশি লিখিয়া অপরাধ বৃদ্ধি করিব না।

আপনার চিঠির জবাব দিই নাই বটে, কিন্তু কি জবাব দিব ভাবিতে গিয়া অনেক দিনই মুশকিল বোধ করিয়াছি। আপনার সব প্রশ্নেরই জবাব দিবার চেষ্টা করিব, তবে মোটামুটি বলিবার কথা এই যে কলেজে ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ পড়ে প্রায় ১২৫টি—I. A., I.Sc., ও B. A. এ সব মিলাইয়া। সংখ্যায় খুবই কম। সেই জন্যই বোধহয় নানা প্রকার দুর্ভাবনার কারণ থাকিলেও কিছু অভিভাবক এখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য পাঠান। আমার যা বিশ্বাস তাহাতে যাহারা এখানে থাকিয়া I. A., I. Sc. পড়া শেষ করিয়া গিয়াছে তাহারা অন্য-কোথাও পড়া ছেলেমেয়েদের চাইতে অভিভাবকদের চোখে বেশি দুঃখের কারণ হয় নাই। অবস্থা মোটের উপর একই প্রকারের। তবে যে সব ছেলেমেয়ের নিজের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বেশি, তাহারা বোধহয় অনেক জায়গার চাইতে শিক্ষালাভের সুযোগ বেশি পায়। শিক্ষার্থীর নিজের মতির উপর ভালোমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে— উপরন্তু নানা বিষয়ে সাহায্য লাভের সুযোগ আছে, ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে আমার যা বলিবার বলা হইল, এইবার আপনার বিশেষ প্রশ্নগুলির উত্তর দিব।

গত তিন বৎসরের I. A. পরীক্ষার ফল

১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১
১৫/২২: ১ম-৬, ২য়-৭, ৩য়-২	১৯/১৯: ১ম-১০, ২য়- ৮, ৩য়- ১	১৮/২২: ১ম- ৩, ২য়-১৫

Staff কেমন আমার পক্ষে বলা শক্ত। তবে পড়াশুনার প্রতি ঝোঁক বেশি এমন ছেলেমেয়ে বেশি না থাকিলেও যে রকম হারে পাশ করে, তাহাতে মনে হয় পরীক্ষার মাপকাঠিতে Staff ভালোই।

কলেজে পড়িতে পড়িতে সংগীতচর্চা খানিকটা হয় তাহা আমি জানি। তবে চিত্রবিদ্যা ও সংগীত এ দুটি একসঙ্গে হওয়ার বিঘ্ন আছে। কলেজে কাজের যে সময় তাহা রক্ষা করিয়া অন্য বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। তিন দিকে একই সময়ে সমান মনোযোগ দেওয়া সাধারণতঃ চলে না। তবে যাহাদের আন্তরিক আগ্রহ থাকে তাহারা সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক দিকের শক্তিরই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এ রকম ছেলেমেয়ের কথা আমি জানি। তবে কৃতিত্ব সবদিকেই সমান হইয়াছে এ কথা বলা শক্ত ; কেহ গানে বেশি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, কেহ বা চিত্রবিদ্যায়।

Hostel এর discipline কেমন এ প্রশ্নের উত্তরও অত্যন্ত কঠিন। এর পরে আপনার আর একটি প্রশ্ন আছে—মেয়েদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ বা সম্ভাবনা কিরূপ? এ দুই প্রশ্ন একই প্রশ্নের দুই দিক। Discipline ব্যাপারটা এখানে খুবই জটিল। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য কর্মের কথা মনে রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ উহাদের নানারূপ স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে বড়ো করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। ফলে তিনি ছেলেমেয়েদের মিশিবার সুযোগ করিয়া দেওয়াই শিক্ষার একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। তবে এই শিক্ষা খুব সাবধানতার সঙ্গে দিতে হইবে ইহাও তিনি অধ্যাপকদের বার বার বলিয়াছেন। সামাজিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে, এবং সমাজের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন থাকিয়া, সমাজের দশজনের সঙ্গে একযোগে কাজের সুযোগ নেওয়াই এই শিক্ষার অনুকূল। দেশের প্রচলিত আচার ও আচরণের, এবং দেশবাসী অনেকের সুস্পষ্ট উচ্চারিত সন্দেহের আবহাওয়া, এই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রকে খুব যে সুগম করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে। কাজেই discipline

এখানে অন্য জায়গা থেকে একটু ভিন্ন রকমের। কোন বিধিবদ্ধ নিয়মতন্ত্রকে অক্ষুণ্ন রাখার কাজ এখানকার disciplineএ হয় নাই। অনেক ব্যাপারেই নূতন করিয়া পরামর্শ করিতে হয়, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষই সে পরামর্শে যোগ দেন। এ রকম ব্যাপার আমি এখানে অনেকবার ঘটিতে দেখিয়াছি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ সকল মীমাংসার ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতেন। এখন তিনি অসুস্থ, তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালীতে ভবিষ্যতে discipline রক্ষার চেষ্টা চলিবে কিনা জানি না। অনেক কথা আসিয়া পড়িল। আপনার প্রশ্নই এজন্য দায়ী। আশা করি বাচালতার পরিচয় দিই নাই।

মোট কথা কলেজে যে পড়িবে তাহার শুভবুদ্ধির উপর আস্থাই এখানকার discipline এর মূল মন্ত্র। তবে কেহ যদি গুরুতররূপে এখানকার সমাজকে আঘাত করে তবে সেও আহত হয়। সংখ্যায় খুব অল্প হইলেও, এ রকম ছেলেমেয়ের আবির্ভাব কখনও কখনও ঘটিয়াছে।

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমার ব্যক্তিগত মতে ভালো। তবে ছেলেমেয়েরা কখনও কখনও যে ব্যবস্থার নিন্দা না করে তাহা নহে।

আপনার শেষ প্রশ্ন আমারই উদ্দেশ্যে করা। Direct supervisionএর দায়িত্ব আমি নিতে পারিব না। কারণ তাহা হইলে আপনার পুত্রের সহিত আমার বনিবনাও থাকিবে না। ১৬ বৎসর বয়স যে অতিক্রম করিয়াছে তাহার মিত্র হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার ছোটখাটো নানা কাজের খবর রাখিতে ইচ্ছা হইবে না। আপনি উহাকে এত বৎসর দেখিয়াছেন, যদি বোঝেন যে একটু দুর্বলচিত্ত, পরধর্মানুবর্তী তাহা হইলে এখানে পাঠাইবেন না। খুব স্বাবলম্বী—সকলরকমে—যদি হয়, তবে পাঠাইলে আমার মনে হয় ভালোই হইবে। একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মাসিক খরচ ৩৫৲ টাকার উপরে যাওয়া উচিত নয়।

এতক্ষণে আপনি বোধহয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আর লম্বা করিব না।··· বেবীরা পুরী হইতে ফিরিয়াছে। এখানকার খবর ভালো। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দিদি ও আপনি প্রণাম জানিবেন। ইতি স্নেহাস্পদ

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩। প্রাক্তন সহকর্মী সুধীরচন্দ্র গুপ্তকে লেখা

শান্তিনিকেতন
২০শে মে, ১৯৪৪ শনিবার

প্রীতিভাজনেষু

সুধীরবাবু, বেলা এখন ৫।২০, সামনে চায়ের কাপ ভর্তি, মুখে সিগারেট, হাতে কলম, লেখা চলছে। যেমন চিরকাল হয়ে আসছে, আজও তেমনি। অনেক মাস হয়ে গেল, এমন দিন বোধহয় একটিও যায়নি যেদিন আপনাকে চিঠি লেখার কথা মনে পড়েনি। এই কিছুদিন আগেই, সুনীপার বিয়ের রাত্রে খেলার মাঠে আমাদের সেই পুরানো বসবার জায়গার কিছু উত্তর পশ্চিম দিকে হকি গ্রাউণ্ডের উত্তর দিকটার গোলপোস্টটার কাছাকাছি একটা জায়গায় বসে সরোজবাবুকে সভাপতি রেখে কথাবার্তা হচ্ছিল। সরোজবাবুই আপনার কথা তুললেন। আপনি এক চিঠিতে ওঁকে কি লিখেছেন তাই বললেন। কিষ্টু, কিষ্টুর বন্ধু সুনীলবাবু (মনে আছে তো ?), সরোজবাবু ও আমি—এই চার জনাই ছিলাম। সেও হয়ে গেল আজ বারো তেরো দিন। আজ চায়ের কাপটা নিয়ে বসেই চিঠির কাগজ তৈরী করে ফেললাম। এক-একদিন মনের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় কেন, আর অনেক দিনই বা হয় না কেন, এ-তত্ত্ব এখন আলোচনা করতে গেলে চিঠি হবে না, পুঁথি হবে।

রাত্রি ১০।১৫

বিকেলে ঐ পর্যন্ত লেখা হতেই নন্দলালবাবু এলেন। কাজেই চিঠি চাপা পড়ে গেল। এখন খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানা পেতে রেখে অসমাপ্ত অথবা সদ্য আরব্ধ লিপিকে সমাপ্তির পথে অগ্রসর করতে বসলাম। ভারি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। খালি গায়ে, ভরা পেটে, সুনিদ্রার সম্ভাবনা ধ্রুব জেনে, মনও বেশ প্রসন্ন। জানিনা, আজ এই সময়ে দিল্লীতে আপনি কি অবস্থায় আছেন। তবে যতই আনন্দে থাকুন না কেন, তুলনায় বেশি না হলেও আমি খাটো হব না, এটা সুনিশ্চিত।

এইবার এখানকার খবর বলে নি। গরমের ছুটিতে বরাবরই লোক বেশ কমে যায় সে বোধহয় এখনও মনে আছে। এবারে কিন্তু অন্যান্য বারের চাইতেও শান্তিনিকেতন অনেক বেশি খালি হয়েছে। আপনাদের পাড়া থেকে শুরু করা যাক। অচ্যুতবাবু এবং সত্যবাবুর বাড়ির অর্ধেকের বেশি নেই। অচ্যুতবাবুর পূর্বদিকের বাড়িটা (বর্তমানে যেখানে সুখময় চাটুজ্যে মহাশয় থাকেন) একেবারেই খালি। সুন্দরদির বাড়ির অনেকেই নেই। প্রমদাবাবুর বাড়ির কেউ কেউ নেই। হরিবাবু ও তাঁর স্ত্রী আছেন। ক্ষিতিবাবুর পুরানো বাড়ি খালি। তার পরের বাড়িতে ভুজঙ্গবাবু আছেন। তার পরের বাড়িটা আপনি যেরকম দেখে গিয়েছিলেন সেরকম নেই। এখন যে বাড়িতে সরোজিনী দেবী আছেন (ছুটিতে বোধহয় নেই) তা আগের বাড়ির অর্ধেক। বাকি অর্ধেক—পূর্বাংশ—ধ্বংস করা হয়েছে। তার পরের বাড়িটাতে গুহঠাকুরতাদের জামাই ছুটিতেও আছেন। অপূর্ববাবুদের বাড়িতে শুধু তাঁর বাবা এবং বোধহয় মাও আছেন। মিনিদের বাড়িতে ললিতবাবু, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর শাশুড়ী—এই তিনজনাই আছেন। সুষ্যির বাড়িতে একঘর ভাড়াটে আছেন। এইবারে গুরুপল্লীর দক্ষিণের নূতন পল্লীর কথা। আপনি যাবার পর যে সব নূতন বাড়ি হয়েছে তার মধ্যের একটার অবস্থান হচ্ছে প্রমদাবাবুর দোতলা বাড়ির পূর্বে। টিনের বাড়ির দুই অংশে দুজনা থাকেন—এক অংশে সুধীর কর মহাশয়, আর এক অংশে হীরেন দত্ত নামে একজন নূতন অধ্যাপক। এঁরা দুজনেই আছেন। প্রমদা-বাবুর ভাড়াটেরা নেই। তার পরের বাড়িতে রেণুরা আছে। বামনবাবুও বর্তমানে আছেন। সরোজবাবু যে বাড়িতে আগে ছিলেন, সে বাড়িতে এখন থাকেন যাদবপুরের হীরালালবাবু। আপনি দেখে গিয়েছিলেন কিনা মনে নেই। ছুটিতে সে বাড়ি খালি। বীরেনবাবুদের বাড়িতে যাঁরা থাকবার, আছেন। ননীবাবুরা নেই। অনুরা আছে, তাদের ভাড়াটে এখন কেউ নেই। বিভূতি সিংহ আংশিকভাবে আছেন। তার পরের বাড়িগুলি এক এক করে মনে করে

যান,—গুহঠাকুরতাদের বাড়ি, সুরেনবাবুর বাড়ি ইত্যাদি। সব বাড়িতেই লোক আছে—পাঞ্জাবীদের বাড়িতে নেই। সন্তোষ মিত্র ও তারপরের ক্ষিতিমোহন-বাবুর বাড়ি পর্যন্ত বলা হয়ে গেল। শৈলেনবাবু সপরিবারে ও আশুবাবুও তথৈবচ, বর্তমানে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাড়িতে আছেন। এইবারে আমাদের পাড়া—প্রবোধ সেন মহাশয়, সুশীল ভঞ্জ এবং আমি আছি; মাসোজি, হসরৎ সাহেব এবং বিনোদবাবু (অল্পদিনের জন্য) নেই। মীরাদি একলা আছেন। উত্তরায়ণে কেউ নেই। ওদিকে ক্ষিতীশবাবু ও ডাক্তারবাবু আছেন। রতনকুঠি শূন্য। হাসপাতাল পাড়ায় কয়েকঘর আছেন। গৈরিকে সুধীন ঘোষ মহাশয়, তারপর রমেশবাবু আছেন। গোপালবাবু এখন নেই। এইবারে নিচুবাংলা—কিষ্টুরা, বিশ্বনাথবাবুরা, দ্বিবেদীজি সপরিবারে, এবং সুশীলবাবু আগে যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়িতে আমাদের বর্তমান রেক্টর বিভূতি গুপ্ত মহাশয়—এঁরা সকলেই আছেন। আর সব বাড়িই শূন্য। এক বাড়ির কথা বলা হয়নি— আপনি নিজে যে বাড়িতে ছিলেন সেখানে গোসাঁইজি শুধু আলোকে নিয়ে আছেন। নগেন আইচ মহাশয় ও তানসাহেবরাও আছেন। কিছু কিছু বাদে প্রায় সকলের হিসাব দেওয়া হ'ল। এত করে চিঠির পর্ব বিস্তারিত করলাম, তার একটা উদ্দেশ্য—আপনাকে মনে মনে শান্তিনিকেতন প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা।

অসম্পূর্ণ। পোস্ট করা হয় নি।

শান্তিনিকেতন
৩০শে ডিসেম্বর, ৪৯ । শুক্রবার

নিরঞ্জন,

আমরা ফুলডাঙায় যাচ্ছি কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে। এখন সকাল সাড়ে আটটা। বসে আছি নন্দবাবুর বাড়ির দক্ষিণের চাতালে। যাবে—পিণ্টু, মানি, বর্ষি, যমুনা, বেবী, সেবকবাবু, নন্দবাবু, আর আমি—এই আট জন লোক। খাওয়া হবে খিচুড়ি আর ডিমসিদ্ধ, আর বোধহয় বেগুনভাজা আরও কিছু টুকিটাকি।

রোজই ভাবছি একখানা চিঠি লিখব। আজ নেহাতই লিখতে বসেছি, ডাকেও ফেলব, পাবে কিনা কে জানে।

কাল ছেলেমেয়েরা সব সিউড়ি গিয়েছিল—'মোর' বাঁধ দেখতে। মাসিমা, সুধাদেবী, উপেনবাবু, নগেনবাবু, তারকবাবু, ধনপতিবাবু, যদুপতিবাবু, আরও অনেকে সঙ্গে ছিলেন।

ঐ পর্যন্ত লেখার পর রওনা হয়ে, এখন ফুলডাঙার এক কাঁঠাল গাছ তলায় বসে চিঠির দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলাম। এখন আমাদের 'শিবির—ফুলডাঙা।' এইবারে সিউড়ি-যাত্রীদের কথা আর একটু লিখে নি। প্রথম কথা হয়েছিল ট্রাকে করে সকালবেলা বেরোবার। তার পর কি কারণে ঠিক জানি না, রেলে যাওয়া স্থির হয়। বেলা সাড়ে দশটায় আমাদের বাসে করে প্রথম দল স্টেশনে গেল—ছোটরা। দ্বিতীয়বারে গেলেন বড়রা। এখান থেকে সবাই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলেন। তারকবাবু ফোনে সিউড়ির ভূতুবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন ওখানে সন্ধ্যেবেলায় লুচি-তরকারি খেয়ে বেরোবার। কারণ এখানে ফিরে আসতে রাত্তির এগারোটা হয়ে যাবে। যারা

গিয়েছিল তাদের কারও সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি—কি রকম কি হল তা শোনা হয়নি। সিউড়ি পর্ব এখানে শেষ করলাম।

এখন ফুলডাঙা-পর্ব আরম্ভ হল। আমার জলযোগের কলা আমার পাতায় পড়েছে।

১লা জানুয়ারি, ১৯৫০ রবিবার, সকালবেলা ১০টা

আমার বাড়ি বসে লেখা

পরশুদিন ঐ পর্যন্ত লিখবার পর আর লেখা হয়ে ওঠেনি। মনের সঙ্গে হাতের কলমের স্বতঃক্রিয় (automatic) যোগ যেদিন সাধিত হবে সেদিন সভ্যতার প্রগতি অনেক বেড়ে যাবে। চিঠি লেখাটা খুবই আরামের, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাত পেরে ওঠে না।

বেলা প্রায় ১টা

এখন আবার যমুনাদের বাড়ির বারান্দায় বসে লিখছি। তুমি নিশ্চয় এ চিঠি পেয়ে পড়তে গিয়ে বিরক্ত হবে। তাতেও আমার ভয় নেই। খেয়ে এসে বসলাম। কলকাতায় ক্রিকেট মাঠে এখন লাঞ্চ্ চলছে। এই মাত্র রিলে বন্ধ হল। ইণ্ডিয়া কাল চারশো বাইশ করে শেষ করেছিল। কমনওয়েল্‌থ কাল কেউ না আউট হয়ে ছিল চোদ্দ। আজ পাঁচ জন বড় বড় খেলোয়াড় আউট হয়ে চুরানব্বই করে খেতে বসেছে। যমুনারা যাচ্ছে, আমি চিঠি লিখছি। আজ ডাকে ফেলবই। তারপর চিঠির কপালে যা থাকে— তোমার হাতে পৌছবেই, রাঁচিতেই হোক বা শান্তিনিকেতনেই হোক।

সেদিনকার ফুলডাঙার বহির্ভোজন শেষ পর্যন্ত বেশ ভালোই হয়েছিল। খিচুড়িতে ছিল কপি, কড়াইশুঁটি, আলু, পেঁয়াজ, ধনেপাতা ; বেগুনপোড়া, বেগুনভাজা, হেরিং মাছ, হেরিং মাছের ডিমের টক, আমের চাটনি (বোতলের —অবশ্য বাড়ির তৈরি), ডিমভাজা, খুব ঘন ক্ষীর (প্রায় 'খোয়া' বলা চলে),

লবাত। জলযোগের পর্ব শেষ করিনি, সেটাও এখন শেষ করি। কলা পর্যন্ত বলেছিলাম ; তারপর পাতায় পড়েছিল— পেঁপে, বিস্কুট, ছোলাভাজা। বিকেলে হল চা, বিস্কুট। Lexicon খেলা, বেড়ানো, গাছে চড়া, ফটো তোলা, ছাগল খাওয়ানো, কুকুর খাওয়ানো—এসবও হয়েছিল। অল্পসল্প ঘুমও হয়েছিল। একটু খবর দিয়ে নিই। মিনির দিদিমা গত পরশু রাত্তির দশটার সময় মুক্তি পেয়েছেন।

এইবারে তোমাদের কথা বলি। তোমরা কোথাও কোনো খবর দিয়েছ বলে শুনিনি। অনেকেই জিজ্ঞাসা করছে, কিছুই বলতে পারছি না। আমি অবশ্য একটুও ভাবছি না, ধরেই নিচ্ছি সব ঠিকঠাক চলছে।

আমি তোমাদের যে ছবি দেখছি—তা এই রকম। তাঁবু হয়তো নয়, অস্থায়ী পর্ণকুটীর জাতীয় কিছু একরকমের আশ্রয়। খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে গাছের ছায়া শুকনো ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার উপর কেউ কখনও বসে, কেউ শুয়ে। জলযোগ, দুবেলার বড় ভোজন ঐ রকমেরই কোনো অবস্থার মধ্যে। ছুটোছুটি, চেঁচামেচি, মাঝে মাঝে নালিশ ও বিচার— 'অমুক কোথায় গেল ?' 'আসতে দেরি করছে কেন ?' 'যাবে তো বলে যাও না কেন ?' 'ওরা উমাদির সঙ্গে ঐ দিকে বেড়াতে গেছে।' 'তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নাও, বাস্ তৈরি'—এই রকম নানা কথা নানা সময়ে চার ধারে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সত্যেনবাবু নিশ্চয়ই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনায় রত। ও বিদ্যালয় কি রকম ব্যবস্থায় পরিচালিত— কোনোই ধারণা করতে পারছি না বলে সুবিধে এই যে, সবরকমই ভাবা চলে। কখনও ভাবছি যে বিজলি বাতি আছে, কখনও ভাবছি নেই। না থাকলেই ভালো, বেশ জোৎস্না চলছে। কেউ কেউ বলেছে— 'চলুন একটু জোছনায় ঘুরি', আবার কেউ কেউ বলছে—'বাবা, যা শীত, কাজ নেই কাব্যে—তার চাইতে

একটু লেপকম্বল মুড়ি দিয়ে গড়িয়ে নি।' স্নানের সময় তো এক বিরাট পর্ব, 'মাথায় একটু জল দিলেই চুলটা যথেষ্ট নরম হবে, চিরুনির দাঁতে বাগ মানবে!' এই রকম ছোটোখাটো কত যে snapshot নিচ্ছি তা লিখে শেষ করতে গেলে পুঁথি হয়ে যাবে। কমলেন্দু, অমলকান্তি, বিমলেন্দু, প্রভাস ঘোষ, রুদ্র রায়, অভিজিত চন্দ, প্রতীপ বাগচি, সুনীতি ঘোষ, আত্রেয়ী মিত্র, গৌরী রায়, কুহু, কেকা, শিখা—এই সব মূর্তি এক একটা মনে পড়ছে, চালচলন ভাবছি, আর যেন চলচ্চিত্রের এক-একটা অঙ্ক চোখের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। এইখানেই ইতি। তোমরা এখানে না থেকেও এখানেই ঘুরছ।

ইতি

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ

৫। প্রাক্তন ছাত্র মোহনভাই পাটেলকে লেখা

শান্তিনিকেতন ৭ই ফেব্রুআরি, ১৯৫৮
শুক্রবার বিকাল বেলা, ৫টা বেজে ৫

পরম স্নেহাস্পদেষু

আজই সকালবেলা তোমার চিঠি পেয়েছি। এখন বসেছি জবাব দিতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ চিঠি লেখা হবে কি না, ডাকবাক্সে ফেলা হবে কি না, তার কিছুই জানি না। আমার পুরানো কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে অনেক চিঠি পাই, যা আমারই লেখা, কিন্তু ডাকে ফেলা হয়নি। খানিকটা লেখা চিঠি, পুরো লেখা চিঠি দুরকমই আছে। তবে আশা করছি যে শেষ করে ডাকে ফেলব।

তোমার কাজের কথা সম্বন্ধে যা বলবার তা আগেই বলে নি। আমি লেখক নই, তবে বাঙালী। বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি, বাংলায় লেখা ভালো বইও কিছু পড়েছি—এ বিনয় নয়, কারণ ইংরেজিতে লেখা বই যত পড়েছি বাংলায় লেখা বই তার চাইতে অনেক কম পড়েছি। তবু তোমার লেখা পাঠিয়ে দিও। আমার দেখা হয়ে গেলে এমন কাউকে দেখিয়ে নেব যাঁর লেখক-সমাজে খ্যাতি আছে। তবে কিছু সময় দিও, আমি দপ্তরখানার কেরানীগিরিতে অভ্যস্ত নই।

১০ই ফেব্রুআরি সোমবার

দেখছ কাণ্ড? শুক্রবারে ঐটুকু লিখেই লেখার দম ফুরিয়ে গেল। আজ আবার দিনের সেই রকম সময়েই বসেছি। ইচ্ছে আছে শেষ করা।

কাজের কথার এক অংশ শেষ করেছি, আর এক অংশ এখন শেষ করব। হরিবাবুর অভিধান পাওয়া যাবে কিনা, আর যদি পাওয়া যায় তবে কেমন করে পাওয়া যাবে, সে খবর পরের চিঠিতে লিখব।

কাজের কথা ফুরিয়ে গেল। এইবার বাজে কথা। এ জাতীয় কথা মনের

ভিতর এত জমেছে যে তা শেষ করতে পারব না। যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করি।

প্রথম হচ্ছে, যে তুমি বড়ো হয়েছ। এ কথা মনে থাকে না। তোমার পাওনা অনেক মান। তা দিচ্ছি। অনেক দায়িত্বের ভার পড়েছে তোমার কাঁধে। এ কথা যখন ভাবি তখন মনে পড়ে যায় তোমার এখানকার বাল্যাবস্থার কথা। কারও ভবিষ্যৎ যখন দেখা যায় না, তখন অনেক আশঙ্কা থাকে। তুমি এখন বড়ো হয়েছ, বাবা হয়েছ—একটু ভাবলেই কথাটা বুঝতে পারবে। তুমি যখন এখানে ছিলে তখন তুমি ছিলে ছোট, আমি ছিলাম বড়। এখন আমি তখনকার চাইতে কুড়ি পঁচিশ বৎসর বড় হয়েছি। আমার দেখা, আমার শোনা, আমার বুঝবার শক্তি— এক কথায় বলতে গেলে আমার 'জ্ঞান' তখনকার চাইতে অনেক বেড়েছে। এখন কোনো এগারো বারো বছরের ছেলে দেখলে তার সম্বন্ধে আশঙ্কা কম হয়। আশঙ্কার কারণ একেবারে থাকে না তা নয়, তবে কুড়ি পঁচিশ বৎসর আগে আশঙ্কার রূপ ও পরিমাণ যত ছিল, এখন তার চাইতে কমেছে।

৬ই মার্চ, ১৯৫৮
সন্ধ্যা, সাড়ে সাতটা,
বৃহস্পতিবার

কি ভাবছ? আমার মাথা খারাপ, এই তো? কিন্তু এত ঠাণ্ডা মাথা কোথাও দেখেছ আমার মনে হয় না। সব সময়েই সব অবস্থায় যে ফুর্তিতে থাকতে পারে, তার মাথা খারাপ যে বলে তারই মাথা খারাপ।

চিঠির জবাব যদি দাও তবে একটা প্রশ্নের সত্যি উত্তর দিও। প্রশ্নটা এই— যবে থেকে তোমার চিঠির উত্তর পাবার অপেক্ষায় আছ তবে থেকে আমার সম্বন্ধে তোমার কি-কি ধারণা হয়েছে একটা-একটা করে লিখবে। পারবে

কি ? এখন তো অনেক বড় হয়েছ, বিদ্যে বুদ্ধির দৌড় কতদূর এগিয়েছে তা কে জানে ? এখনও পরীক্ষা দেবার বয়স বোধ হয় পার হয় নি।

এই এক মাসের মধ্যে তোমার একটা কাজের কথার আর একটু জবাব দিয়ে নি। হরিবাবুর অভিধান এখন পাবে না। তবে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে ছাপাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ওরকম একটা অভিধান ছাপাতে যে অনেক সময় লাগবে সে তো বুঝতেই পারছ। আমার সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ রেখো, আমি সময়মতো তোমাকে কি করতে হবে জানাব।

আজকে এ চিঠি শেষ করে তবে উঠব। কাল ডাকে ফেলবই ফেলব। যদি ইচ্ছে হয়তো জবাব দিও। শান্তাকে আমার কথা বোলো। বাংলা যদি ভুলে না গিয়ে থাকে তবে এ চিঠি ওকেও পড়তে দিও। ওর মজা লাগবে। তোমার সন্তানদের ভুলে গিয়েছি। বলেছিলে ওদের ফোটো পাঠাবে। সম্ভব হয় তো পাঠিও। ওদের নাম আর বয়স জানিও।

মাঝে মাঝে যদি চিঠি লেখ, আর আমি বেঁচে থাকি, তবে আরও বাজে কথা শোনাব। এখানে আমরা সবাই ভালো আছি, আশা করি তোমরাও আনন্দে আছ। ইতি

তনয়দা

মোহনভাই পাটেল তাঁকে লেখা তনয়েন্দ্রনাথের শেষ চিঠিখানির প্রতিলিপি তনয়েন্দ্রনাথের কন্যা নিবেদিতা বসুকে পাঠিয়ে তাঁকে যে-চিঠি লেখেন সেখানিও ছাপা হল—ছাত্রদের পরিণত মনেও তনয়েন্দ্রনাথ যে আসন গ্রহণ করেছিলেন চিঠিখানি তারই অন্যতম নিদর্শন।

আহমদাবাদ
23 April, 1958

দিদির করকমলেষু,

আজকে আবার চিঠি লিখতে বসেছি। তনয়দার পরলোক গমনের পর আপনার পাঠানো চিঠির পর থেকে দিনের মধ্যে কতবার যে তনয়দার স্মরণ হয় তার কোনো ঠিক নাই। যতবার স্মরণ হয় তাঁর লেখা শেষ চিঠি নাড়াচাড়া করে থাকি। যতবার পড়ি তাঁকে যেন আপনার বাড়ির পেছনে আরাম-কেদারায় বসে আছেন—এরকম দেখতে পাই। আমি যখন ওখানে আসি তখন তাঁর সঙ্গে যা কথা হয়েছিল, তা সব যেন একটির পর একটি স্মরণ হচ্ছে। সে কথা আর ভুলবার নয়। ও সব কথাগুলি যত সুন্দর এবং মিষ্টি ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ছিল বোধপ্রদ। আর ওসব কথা কোনোদিন শুনতে পাব না, এ কথা যেন ভাবতে পারছি না। আপনি আমার ভালোবাসা জানবেন। বিশুদা, মাস্টারমশাই আর মাসিমাকে আমার ভক্তিপূর্বক প্রণাম জানাবেন। আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদ কামনা করি, তনয়দার শেষ চিঠির নকল আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিবিড় স্নেহ তিনি যে কি রকম ভাবে কথার আড়ালে লুকিয়ে আমাদের দিয়ে থাকতেন, তার একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ আমার কাছে রেখে গেছেন। প্রত্যেক দিন শোবার আগে এবং সকালে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তনয়দার কথা স্মরণ হয়। অত্যন্ত সরল-সহজভাবে প্রার্থনাও হয়ে যায়। আর বেশি লিখছি না। ইতি মোহন

লেখকসূচি

বর্তমান ছাত্রছাত্রী

পর্যায়ক্রমে লেখকদের নামের সঙ্গে সঙ্গে রচনাকালে তাদের বয়স/বর্গ, ভর্তি হবার তারিখ, রচনা-সংখ্যা, ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া হল।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী

সহকর্মী

চিঠিপত্র

তনয়েন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত

---

১ প্রাক্তন ছাত্র (১৯২৩-৩৮)

২ প্রাক্তন অধ্যাপক (১৯২৬-৩০)

৩ প্রাক্তন অধ্যাপক (১৯৩৫-৪২)

৪ প্রাক্তন ছাত্র (১৯২৮-৩৩)





সন্তোষালয় । শিশুবিভাগ । তনয়েন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র